লিপিসত্র

দিল্লি থেকে প্রকাশিত

একান্ত মননশীল সাহিত্যভূমি

জুলাই- ২০২৬ সংখ্যা



সম্পাদক রতন মতিলাল

প্রকাশক ত্রি.দৌল এর পক্ষ থেকে বাম্পী শর্মা

লিপিসত্র

দিল্লি থেকে প্রকাশিত
একান্ত মননশীল সাহিত্যভূমি

জুলাই, ২০২৬ সংখ্যা

সূচীপত্র

কিছু কথা।।

তরুণ কবি ও কবিতা, আশার আলো না আশঙ্কার আঁধার।

সেলফোনে ভেসে আসল একটি সংবাদ। আনন্দবাজার পরিবেশিত সংবাদ। মূল কথা হল,ত্রিশ পেরোয়নি এমন কবিদের কবিতা নিয়ে বর্তমান সংখ্যা 'কৃত্তিবাস' – এই সংখ্যার জন্য শুধু ই-মেইলে তরুণতর আর তরুণতমদের কবিতা এসেছে আট হাজারের মতো।

এখানেই আশার আলো।বাংলা কবিতাচর্চা বেঁচে থাকার মূল মন্ত্র।

দেখা গেছে বিভিন্ন সাহিত্য আসরে অংশগ্রহণকারীদের গড় বয়স সবসময়ই ৬০ এর উপরে থাকে। বিভিন্ন আলোচনায় উঠে আসে তরুণ প্রজন্মের দূরে থাকার প্রশ্নটি।বহু চিন্তার বিষয় নিয়ে অঢেল মন্তব্য করেছেন বহু বক্তা।

আরও দেখা গেছে কিছু লিট-ম্যাগ সম্পাদক তরুণ তরুণ বলতে পাগল,নানারকম স্কিম চালু রাখেন।ছুট দেওয়া আছে,যা খুশি লেখ,উত্তর আধুনিকতার নামে ইংরেজি হিন্দি লোকাল ভাষা ইত্যাদি যেমন তেমন লেখা লেখ। সম্পাদকরা এখন লক্ষ্মণরেখা টেনে দিয়েছেন,৩০/৫০/৬০ বছরের বেশি কেউ লেখা দেবেন না।

ভাবতেই হয়,ইংরেজি মিডিয়ামে পড়াশোনা করা, এনএমসিতে চাকরি করা, জীবন চালাতে নানান প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আছেই। বাংলা ভাষার প্রয়োজন নেই বললেই চলে।আর কবিতা! সবাই বলে,কজন আর পড়ে। নিজের কবিতা নিজেই পড়ার দিন এসে গেছে। অগ্রজদের কবিতা নিয়ে বর্তমানে কেউ আর মাথা ঘামায় না।

মূল বাংলার বাইরে সাহিত্য চর্চা আরও শোচনীয়। বিস্তারিত প্রসঙ্গ না তুললেও চলবে।সবাই জানেন। তবুও আশা এই যে চর্চাটা চলছে নানাভাবে।স্কুল কলেজ থেকে বাংলা বিভাগ বন্ধ হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। বিভিন্ন সংস্থার লাইব্রেরী বন্ধ হয়ে গেছে। বই

পড়ার কেউ নেই।

এমন অবস্থায় উপরিউক্ত খবরটি আশা যোগান দেয়। ত্রিশ পেরোয়নি এমন কবিদের আট হাজার কবিতা – সত্যি বিস্ময় জাগায়। আগরতলার এক সম্পাদক, যে একফর্মার কবিতা বইয়ের একটি প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত,জানাল প্রায় ২৮০০ পাণ্ডুলিপি জমা পড়েছে।অবাক হবার বিষয়। আশার আলো ডগমগ করছে।

কিন্তু... কিন্তু... যেটা আশঙ্কার বিষয়। তাহলো আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে – এ আই (AI)।কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।আগরতলার সম্পাদক জানাল যে তার সন্দেহ হচ্ছে, কিছু পাণ্ডুলিপি এ-আই জেনারেটেড।অনেক সম্পাদক লেখার সঙ্গে সার্টিফিকেট চাচ্ছে এই মর্মে যে প্রেরিত লেখাটি এ-আই জেনারেটেড নয়।কাজেই আশঙ্কা অমূলক নয়।সন্দেহ জাগে,যখন সকাল ন'টায় বসে বিকেল চারটার মধ্যে একটা উপন্যাস লেখা হয় শারদীয় সংখ্যার জন্য। তাহলে ,,,,প্রশ্ন জাগে। বলি Extraordinary মেধার কথা আলাদা।মাইকেল মধুসূদন একরাত্রির মধ্যে নীলদর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন।

আমরা মনে করি একজন কবি বা সাহিত্যিক হবার প্রথম শর্ত হল,সততা।শুধু তরুণ নয় সবার মধ্যে সত্য ও নিষ্ঠা থাকুক সাহিত্যচর্চায়।

বিবর্ণতা, দুঃখ নদীর ধারে

সমরেন্দ্র বিশ্বাস

একটা পৃথিবী শূন্যতায় বিবর্ণ হয়ে গেলে
উদভ্রান্ত বসে থাকি
তখনই আরেকটা পৃথিবী মায়াবিণী জেগে ওঠে সমুদ্র কিনারে,
হাসে ভালোবাসে ছুঁয়ে থাকে শ্যাওলা চাঁদের ম্লান আলো!
শনশন বাতাসে ভাসে ভয়পাখি,
একজন তো হারিয়ে গেছে শূন্য পৃথিবীতে, আশঙ্কায় থাকি
আমার দ্বিতীয় পৃথিবীটাকে নিয়ে একদিন হয়তো বিবর্ণতায় তুমিও!
বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে লাউপাতা থেকে বিন্দু বিন্দু সবুজ
তখন পিপাসার্ত আমি উৎসবহীন অনশনে!
একটা সমুদ্র হয়ে, একটা পৃথিবী হয়ে তুমি কি একবারও ফিরে আসবে
অনশনক্লিষ্ট শ্বেতপায়রার শেষশয্যার পাশে, দুঃখনদীর ধারে?
তোমার ভালোবাসার ম্লান দৃষ্টি যুগ যুগ নিরুত্তর।

বিরহী পথ

শুক্লা গাঙ্গুলি

বলতে গিয়েও বলা হয়নি যে কথা-
তারই খানিকটা আটপৌর আঁচল হয়ে পথ আটকায় মাঝ বরাবর
বিরহী পথ-
চৌকাঠের মাপসই মনে আজও জমানো জিগ্গাসা
নির্ভার হতে চেয়ে, ব্ল্যাকবোর্ডে টানি সরলরেখা-
কে বা কারা মুছে দেয় তা অলক্ষ্যে...
আগুন্তক মেঘ, বৃষ্টি নিয়ে এলেই-
আতিশয্যে বাঁচে ভালোবাসা
শুধু আমারই মতো করে...

কৌশিক সেন – এর দুটি কবিতা

উষ্মা

মেধা নাই, শবদেহ শুধু
মেধা নাই, শবদাহ শুধু
অঙ্গবস্ত্র খুলে রাখি তীব্র প্রদাহে
বকলমে লিখে রাখি অন্ধকারটুকু।

শোক নাই, শূন্যতা শুধু
শোক নাই, শুভ্রতা শুধু
উষ্ণীষ খুলে রাখি তথাগতবেশে
নখর আঁচড়ে লিখি বেলপাতাশুচি।

লক্ষ্য নাই, প্রাণপাখি ধরা
লক্ষ্য নাই, ম্লান বসুধারা
মুখোশ খুলেছি আজ ব্যাধির প্রভাবে
জিভ দিয়ে লিখে রাখি লাস্যবিলাস।

ব্যাথা নাই, পুণ্যতোয়া সব
ব্যাথা নাই, পুণ্য বেয়াদব
কবচ খুলেছি আজ জিজীবিষা পাশে
অশ্রুজলে লিখে রাখি ইশতেহারখানি।

ক্রিমেটোরিয়াম

ইচ্ছেপত্র রেখে আসি কফিনের বামে
যদিও কর্কশ এই হাওয়ামোরগের স্বর
তবুও ধুয়েছি শোক এই চন্দনচুয়াজলে

স্থাপনের কিবা প্রয়োজন! বরাবর
গথিকপাহাড়। রবিবারে ভরে ওঠে প্রার্থনাগৃহ
চাঁদের হদিশ থেকে ঘুরে আসে পূর্বপুরুষ

অক্ষর ভুলে গেছি সব। ইচ্ছেপত্র আলগোছে
লিখে রাখি ভেদাভেদ, ক্ষমতার পৌনঃপুনিক
আলোর ক্যারলে লিখি ভোজালির মার্জনাটুকু

আসলে সে গান নয়, কান্নার প্রকরণ যেন
লিপি একই, স্বর একই, বিলাপে তফাত
ইচ্ছেপত্র ফেলে আসি অন্ধকারে, কবরখানায়...

আকাঙ্খিত

বিবেকানন্দ চৌধুরী

অদ্ভুত কাল জাবর কাটা
নিরালম্ব আকাঙ্ক্ষার বাজি
ধরে ধর্ম রক্ষা যায় না

হাউই যানে কখনো টপকাইনি
ভেসে যাইনি কারো বিপুল চমকানিতে
অফুরন্ত ঢক্কা নিনাদ বিকর্ণ করেছে
আমার নরম হৃদয়ের বারোটা বাজিয়ে

অজস্র অভিলাষ ধুলো হয়ে
আবেগ চাকা গড়িয়েছে বিপুল স্বপ্ন দেখে
পরিত্রাণ কি উপায়ে বাতলেনি কেউ
এখন যৎপরোনাস্তি হাঁটছি দেখছি শুনছি

পথের আকাঙ্ক্ষায় পথ ডাকে
স্বপ্ন হাওয়া কান ঘেঁষে চলে যায়
তৎসম শব্দে আমি বিষণ্ণ অভাজন

বেদন অক্ষর দিয়ে সাজাই নিজে
টিটকিরি হেলাফেলা বায়ুর ঠেলায়
কাজলে লেখা হয় ঝকঝকে
কালো অশ্রুসিক্ত বর্ণ শব্দ রেখা

পারকিনসন

অমল কুমার বর্মন

আমার চলাচল এখন নড়বড়ে
পারকিনসন রোগীর মতন
এদিকে বৃষ্টি হলে ওদিকে রোদ
অসামাল দায়িত্ব বোধ

এ পাড়ায় কোন ব্যামাগার নেই
তাই থেরাপি নেয়া যাচ্ছে না
ভরসা শুধু ঔষধ
আর সেই মহান ঈশ্বর ---

জিগীষার জ্বর

স্বপন শর্মা

লুকোতে পারি না কেন জিগীষার জ্বর !
আবিষ্কার নেশা !
ভেতরে ভেতরে কেন পুড়ে হই ছাই ?

জ্বরে পুড়ে কেন লিখি আত্ম-সমর্পণ গাথা ?
সীমাহীন শূন্যতার কাছে
কেন অবিরাম শুনি " আরও কিছু আছে । "

সাফল্যের মরীচিকা ? সম্রাটের স্পর্ধা ?
মৃত্যুহীন কাল আনা হাতের মুঠোয় ?
সময় শাসনমুক্ত হতে জরা ব্যাধি যন্ত্রণা সাধনা?

জিগীষার জ্বর
প্রলাপ বকিয়ে নেয় পিচ্ছিল পথের ।
মাকে আমার থেকে কী লাভ বিচ্ছিন্ন করে ?

জিগীষার জ্বরে আছে পরাজয়, গ্লানি
এ জ্বরের তীব্রতার কাছে হার মানি ।

সমর্থন করিনি তার কোনো অজুহাত

সুচরিতা চক্রবর্তী

চলো জঙ্গলে যাই,এখন আমাদের জঙ্গলে যাবার সময়
চলো স্তব্ধতা খুঁজে আনি পাইনের কাছে
উদযাপন না হয় থাক
ভীষণ রকম ক্ষিদে আমাদের তাড়িয়ে নিচ্ছে স্ফটিক চিকচিক
ভাঁড়ারের আলু মুলা দু চোখের নিত্য পিপাসা
নিজেকে শতটুকরো করে বিলোতে যাবো কেনো
কেনো বা পীড়িত ব্যকরণ নদী হয়ে বয়ে যাবে এখানে সেখানে
বড়ো নির্জন প্রশ্ন করি যদি এক --
তাদের মুখ এতো ফ্যাকাসে কেন?
জানি আশ্চর্য বিকলাঙ্গ ঠোঁটের কাঁপুনি
চাঁদ হীন অন্ধকার
জঙ্গল নদী মরুভূমি ন্যুব্জ শীর্ণ তার অবয়ব
চলো ভাবি শলাকার ধারে এতো অবিশ্বাস লেগে থাকে কেনো
আমাদের চোখ ক্লান্ত এখন মিছামিছি বয়সের ভার বেসুমার
কতখানি উঁচু হতে চাও কতখানি জল কণা ভাসিয়েছো বুকে
ছলা কলা ক্যানভাস রঙ তার চিত্র বাজিকর
চলো যাই গ্রামের দিকে - শ্মশানের দিকে হাতে হাতে পাইনের পাতা।

শামীম নওরোজ - এর দুটি কবিতা

কালকথা

জলের কোনো জাত নেই
পাখিদের কোনো ধর্ম নেই

নির্জন কুটিরে বাস করে বুলবুলি একা
শিকারী নজর রেখেছে চড়াইয়ের দিকে

মোরগের রাত্রি নামে মহল্লাতে

কেউ কাউকে চেনে না আর
সবাই অচেনা হয়ে গেছে

অতলান্তে প্রশ্নচিহ্ন
উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কাক
অদৃশ্যের দৃশ্য খোঁজে মানুষেরা

শিকারী শিকার পায়নি
ফিরে যাচ্ছে বাড়িতে

নিয়ম

ভাঙার প্রচেষ্টা বৃথা হয়ে গেছে

মুছে দিতে হবে পরিচিত জীবনের
প্রতিচ্ছায়া

দাসত্ব স্বীকার্য নয়
প্রথা বলে কিছু নেই

ভূগোলের এটাই নিয়ম
বারবার পালটে যায়
পালটে যায় নিয়মের ধারাপাত

শাহানারা ঝরনা – এর দুটি কবিতা

নতজানু সময়

বিলাসের সুতন্বী ফন্টে কারুবাক নকশা আঁকি
অনাবাদী দিন কিংবা ফুল্লরা রাতের
সমীকরণ বুঝি না
বেঢপ পাথরে খোদিত শোকগাথা কখনো
অস্তিত্বের মারণাস্ত্র হয়, দালাল স্বপ্নেরা হাসে
কর্তব্যবিচ্যুত মানুষ কাঁদে
পড়ে থাকে দানশীলতার শূন্য গোলা
অতর্কিত ভয়ের বাহাস নিয়ে আর কতো
কাটবে পক্ষীজীবন!
দুন্দুভি দামামার অভ্যুদয়ে প্রেক্ষাপট পাল্টে যায়
নতজানু সময় বদলায় রঙ।

সুদূর সৈকতে

নিঃশব্দে নীরবতার মাঝে সৌন্দর্য খুঁজি
আবেগময় ক্যামেরা আর পঙ্খীরাজ
চেতনার বিস্তার নিয়ে দিব্যি ঘুরিফিরি
মনুষ্যত্বের দরগায়
ধূপজ্বলা সন্ধ্যার সেলিব্রিটি মননে জাগে
হতাশার আবেশ
বিষাদের বরফ ভেঙে মানুষ ছোটে
কাছে ডাকে নীলগিরি পাহাড়
দিকশূন্য উদ্বেগে ভাসে স্বকীয় প্রতিকৃতি
তারুণ্যলিপি হারিয়ে যায় সুদূর সৈকতে।

কেউ কোথাও ডাকে

সোহরাব পাশা

ভালবাসা- পথের গ্রীবায় গূঢ়সন্ধি
বিচ্ছেদ ভ্রমণ
দেয়ালের নকশায় মলিন সন্ধ্যার
ধূসর কঙ্কাল
চতুর্দিকে গ্রন্থি -বাঁধা ছায়ার কুহক
অসুখ সময়

কোথাও বুনো ফুলের নির্জন গন্ধ
স্মৃতির পিয়ানো বাজে
দূরে কেউ কোথাও ডাকে ,
পাখি ও পাতাঝরা নিবিড় শব্দে

তোমার সেই চোখ খুব মনে পড়ে
মন পোড়ে
ডালিম ফুলের স্নিগ্ধ রোদের ভিতর
মুগ্ধতা মুখর হাসি ।
'দিগন্তে সূর্যাস্ত হচ্ছে ।'
কোথাও যাওয়ার কথা ছিলো---

বিকাশ দাশ -এর তিনটি কবিতা

শিলালিপি

গভীর সমুদ্রে যে মুখ একবার ডুবে যায়
সে মুখ তুলে আনা সহজ কর্ম নয়।
তবু জেগে থাকে --
উঠোন জুড়ে স্যাঁতাপড়া দাগ, আর--
অস্পষ্ট শিলালিপি ঘরময়।

এখনও দু-চোখে লগ্ন হয়ে আছে
সেই সব ছবি অজন্তার
তাই, তুমি হলে নীল নির্জনের একলা বাতিঘর
আমি শুধু অনন্ত রবিবার ।

এখনও বিষাদের ঘরে নোনা মাটি
সেই মাটি জুড়ে তক্ষকের ঘর - মন্দ অসুখ ,
ভেঙে যাই নিয়ত শব্দ নিয়ম
ভেঙে পাই তোমার অক্ষত মুখ।
তুমি তো জানো মৃত্তিকা --
না ভেঙে -- ভেঙে যাওয়া
আমার পুরানো অসুখ।

জন্ম ঋণ

বিকাশ দাশ

একটি রাত পেরোলেই
নতুন রাতের বালিশ সুগন্ধি বুনলে
আমার উপোষী দিন তোমার হাতের নির্মাণ হয়ে গেলে
আমিও লাজের উঠোনে উন্মুক্ত করে দেব এই গৃহবাস।

এতকাল রাতের প্রতিটি কথা
সত্যি হয়ে ফুটে উঠবে কয়েকটি তারায়
যে বিচ্ছেদ জন্মদাগ রেখে ঝর্ণার জলে পা দোলায়
তার শেষ ফোনালাপের অনুরণন বনে প্রান্তরে একলা পথিক।

আশীর্বাদ চেয়েছে শিশির বসন্তের পা ছুঁয়ে
এক রাতের কথা কেমন হেঁটে যাচ্ছে অন্য রাতের দিকে
আমি সুখ লিখে রাখি তোমার ঠোঁটে নির্ভার
এক জন্মের শোধ, যত যতিচিহ্ন।

ময়লা মন খারাপ

বিকাশ দাশ

যখন একটা আধ ময়লা মন খারাপ
একটা আস্ত দুপুর পেটে পুরে আমাকে ধ্বংস করে দেয়
আমি তখন সেলাই করা বিকেলের গায়ে
একটা গোটা ভারতবর্ষের ছবি আঁকি
ভেজা ভেজা অক্ষর সাজাই
ভাবনার গায়ে তালি দিই।

যখন আধ ভাঙা ভুলেরা শরীরে কষ্ট আঁকে
আমি মন খারাপ পুড়িয়ে উষ্ণতা খুঁজি।
চা বাগানের এক চামচ রোদ এনে দেয় ভেষজ ঘুম
পালিয়ে যাওয়া পাতলা আকাশ আরও গাঢ় হয়
আমার হারানোর কিছু ছিল না, কেবল এক বালতি মন খারাপ ছাড়া
চাওয়ার মধ্যে খেজুর রসের অনন্ত সকাল
এক পেয়ালা সুখ, এক বারান্দা আলো
আর মনের জ্বর মাপা একটা সন্ধ্যা।

কাচের চুড়ির মতো ঠুনকো ভালোবাসা
প্রজাপতির হয়ে হাতে বসলে
আমি ফোনের ভেতর আলগোছে চুমু খাই
আর মন খারাপ উড়িয়ে হো হো হেসে উঠি।

অভিষেক ব্যানার্জি – এর দুটি কবিতা

চেয়ে আছি

টিমটিম আলোয় আঁকি জীবনের পোট্রেট,
হেঁটে যাচ্ছি উজানপানে যেখানে গেলে চাঁদকে গোল দেখায়,বহুদিন দেখি নি তাকে;
আমি চেয়ে আছি –
চন্দ্রালোকিত শুভ্র জ্যোৎস্নার অবগাহনে মত্ত হবো বলে...

কবে

ভাবিস কি বল সময় বদল
ওসব বালাই নেই,
সৃষ্টিকর্তার বিচার ঘোরে
গরীব শোনে যেই।

যখন শোনে খুব বিপাকে
চেষ্টা করছে ওঠার,
বিরক্ত সেই একই গল্প
দে ঠেলে দে আবার।

কী বেয়াদপ,ভিখারির দল
কান করে দিলো কালা,
এখন শুধু বিত্ত দেখি
যাহ যাহ তোরা পালা ।

লড়াই করে প্রাণ যায় যায়
ঘড়ি চলবে কবে?
যেদিন শবে উঠবে ধোঁয়া
সেইদিন সময় হবে।

সীমান্ত পথিক – এর দুটি কবিতা

প্রয়োজনের ঋতু

আমি প্রয়োজনে প্রিয় হয়েছি,
রূপের রূপান্তর দেখেছি বহুবার।
বারবার বোকা হয়ে ভালোবাসা কুড়িয়েছি,
সন্তর্পণে সীমারেখায় একা থেকেছি।

কখনো শব্দেরা পাশে বসে কেঁদেছে,
কখনো নীরবতা দিয়েছে দীর্ঘ সাক্ষ্য।
মানুষের চোখে দেখেছি ঋতুর পরিবর্তন—
অভিমান শুকিয়ে গেলে জন্ম নেয় স্বার্থ।

আমি তবু ভাঙা কাচের মতো আলো ধরেছি,
অন্ধকারের ভেতরেও আগুন বাঁচিয়ে রেখেছি।
যারা চলে গেছে, তাদের পায়ের শব্দ
আজও গভীর রাতে দেয়ালের ভেতর বাজে।

সময়ের কাছে হেরে গিয়ে বুঝেছি শেষে—
সব কাছাকাছি থাকা মানেই আপন নয়;
কিছু মানুষ শুধু প্রয়োজনের ঋতু হয়ে আসে,
ফুল ঝরে গেলে আর ফিরে তাকায় না কেউ।

সময়ের গঙ্গা স্নান

হাওয়া বদলায় সময় সাপেক্ষে,
কিছু ফুল ফোটে উল্লাসের ধ্বনিতে,
আর কিছু জলে ভেসে চোখ হারায়
সূর্যাস্তের লাল রঙে, রঙধনুর অপেক্ষায়।

প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা গুলে যায়
প্রজন্মের নতুন গঙ্গাস্নানে।
চোখে দেখা কত নাট্যমঞ্চ মাথা কুটে
একে একে ভাঙা ঘরের দরজায়।

ঘৃণাভরা পোশাকের টুকটুক শব্দে
অবিশ্বাসের দস্তানা আসে অলংকারে।
এক দেশের মানুষ আর জলে-ভেজা
আদর্শ
স্নান সেরে হেঁটে চলে বঞ্চনা।

হাজারও বজ্রকণ্ঠ ডুবে যায়,
আর দিয়ে যায় প্রবাদের বন্যা।

সজল কুমার বসু – এর দুটি কবিতা

স্বপ্ন

ছেলেটা স্বপ্ন দেখত
হাওয়া বদলের স্বপ্ন
ফাঁক পেলেই শোনাত সে সব কথা

কোথাকার কোন উত্তুরে হাওয়া
কিভাবে এসে
পশ্চিমের খর বায়ুকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে
শান্তি বিরাজ করবে.....

স্বপ্ন দেখতে দেখতে
একদিন
ছেলেটা পৌঁছে গেল
যেখানে সবাই একসাথে স্বপ্ন দেখে

তারপর
সে আর বাড়িমুখো হয় নি ।

না নয়

ঠিক করেছি
এবার থেকে আর না বলব না

লোকের মনে তো একটু জায়গা পাব!

এ যাবৎ অনেক না বলেছি।
তবে সে না
নিছকই না বলার অভিপ্রায়ে নয়

বুঝল না কেউ
মনে জায়গা দিল না

আর না নয়

কেউ পেট্রল আনতে বললে আনব
আগুন -- তাও আনব
গঙ্গাজল -- সেও এনে দেব
আর না নয়।

ভাঙা পুতুল

প্রাণজি বসাক

ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে তাপপ্রবাহ এ-গলি সে-গলি
লুপ্তপ্রায় বৈশাখী ঝড় সে এসেও আসে না স্ব-শরীরে
গলির ভাজা ভাজা ধুলোবালি খানিক উড়ে বসে যায়
শুষ্ক দেহে ঘাম বসে না রেড়িয়ালা ডাব বেচে সারাদিন
বৌটি তার শীর্ণ হাতে ধরে থাকে কিউআরকোড ছাপ

নগদ কারবার উঠে গেছে বহুদিন এই তো আছে দিন
রাতে তার ঘুম আসে না গরমে নালার ধারে বস্তি ঘরে
একজোড়া কাঠবেড়ালী দৌড়ায় দিনরাত টিনের চালে
কত কত মানুষ আসে যায়   মানুষের ভিড়ে ঠাসাঠাসি
গলিতে গরম ভাপে সেদ্ধ হয়   মানুষের যত কারসাজি

একদিকে এক মিনিট অন্যদিকে চার মিনিট সময়ের
মাঝে অপেক্ষা আমার গুণিতক শুধু নামতা শেখায়
দরজা থেকে বহুদূরে দাঁড়াতেই পরের স্টেশন আসবে
আর আমি সমেত সমবেত গুঞ্জন নেমে যাবে গন্তব্যে
গতকালই দলবদল করে পাল্টি খেয়ে অন্য দরজাটা

পেরিয়ে   কতসব ত্রস্ত্য বাক্য আওড়ে গেলে   উচ্চ স্বরে
পৃথিবীর ভাষায় আনত অনুরোধ আত্মা জড়িয়ে ধরে
ভাষা ফুরিয়ে গেলে বন্ধুত্বে আর কোনো দুঃখ থাকে না
যতবার এলে ততবারই শুনিয়ে গেলে ঈশ্বরের আদেশ
রোদ পিঠে রেখে   শুধুই প্রার্থনা   মানুষকে ভালোবাসো

অত জোরে হাঁটছ কেন - গমক্ষেতের আলপথ ধরে
অত দ্রুত কোনদিকে যাচ্ছ খুব সাবধানে পা বাড়াও
বেলা পড়ে গেছে   ঐ দূরের আকাশে   সন্ধ্যার ভূগোলে
বাতাসে গ্রামীণ বিষন্নতা শনশন করে দীর্ঘশ্বাস মহলে
ফিরে এসো   এপাশের পিচরাস্তা ধরে   গুরগাঁও যাব

বড় হতে হতে   শহরটা   কত বড় হল   দূরের ভাবো
কেউ আর আশপাশ থাকে না দূরন্ত গতিতে ছুটে যায়
তাই বলি একটু আস্তে ধীরে চল জীবন বড়ই ছোট
একফালি গ্রামীণ মেঠোপথ দেখবে বলে   চোখে পড়ে
সবকিছুর পেছনে মানুষের   অভিসন্ধি ভালোবাসাহীন

শত্রুদের দলে আজ আমি চুম্বনদাগ রেখে আসি –
কারা শত্রু কে তাদের লিডার এসবের কোনো ইয়াত্তা
নেই   শুধু উপযুক্ত সময় হলে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাবে
মুহূর্তে সমস্ত দাগ মুছে যাবে   চূড়ান্ত লক্ষ্য সার্থক হবে
এক এক করে নজরে রাখা হলো   উপযুক্ত দাগচিহ্নে

আমাকে এক ডাকে সবাই চেনে আমার একটাই নাম
আমি দৃষ্টির অগোচরে থাকি অথচ সঙ্গে সঙ্গে থাকি
কেউ আমাকে আদর করে কখনও   চা-মুড়ি   দেয় না
আমার সে-সবে লোভ নেই শুধু ওত পেতে বসে থাকি
সময় হলে মানুষের ঘাড়ে চেপে বসি মৃত্যু আমার নাম

শব্দরা সব পুড়ে গেছে ছাই-ছাই কাগজপত্র ভাষাহীন
গ্যারান্টি নিয়ে কোনো লেখা নয় বলে গেছে   ভক্তবৃন্দ
অবোধ বালকের মতো ভাঙা অক্ষর নিয়ে বসে থাকো
খেলার মাঠে শুধু খেলাই হবে এতে আর গ্যারান্টি কী
যুদ্ধ মানে শুধু মুখোমুখি যুদ্ধ নয় চাই কৃষ্ণের চালাকি

ভোটযুদ্ধ সে এক অন্যরকম খেলা তা খেলে ইভিএম
কিন্তু কিন্তু করেও পরন্তু কতরকমের চালিশা পড়া হয়
হেলেদুলে মানুষ চলে মগজে গ্যারান্টি কী তবে ভরসা
আলোআঁধারির রহস্যময় সিংহাসন বাতাসে ওড়ে ঐ
যারা জানে তারা জেনে গেছে   দৌড়ে কে জিতে আছে

বোতল ভর্তি রোদ ছিপি খুললেই গিলে খায় অন্ধকার
শাহজাদার রোদ লাগেনি বে-লাগাম রাজত্ব চলে তার
অধিকাংশ ছায়া ঘোরে উদ্ভট প্রশাসন ব্যবস্থার চক্করে
ঢেকে রাখো সমস্ত কুলীন উপাচার সমস্ত যন্ত্রণা বোধ
খুলে খুলে দেখা চামড়ার পাটাতনে লিখিত মর্মবেদনা

অসমান অনুর্বর ভূ-খণ্ডে পড়ে থাকা অসমর্থিত খসড়া
আরও কয়েকবার বদল হলো ঋতু   অথচ বিমূর্ত স্বরূপ
মানুষের আয়ত্বে থাকে না আগামীকাল   সকাল   সন্ধ্যা
দূর দূর থেকে ছুটে আসে বন্ধু মানুষেরা   দুপুরের রোদে
ভালোবেসে পাশে বসে   কথা কয়   মনের মানুষ হিসেবে

নাক ভাঙা পুতুলটা তুলে রাখা দরজার মাথায় কবে
চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে   ভোঁটকা মুখের অবয়বে
সে তবে পাহারাদার অক্ষরে অক্ষরে টের পাই   যখন
ঘুমের মধ্যে আওড়ে যাই কবিতার ব্যথার   দুঃখগুলি
কাপড়ের হাত দুটো সেলাই করা   জগন্নাথদেব যেমন

তবে তার কোনো অযথা দুঃখ ছিল না মুখের হাসিটি
সে কথা বলে — সাড়ে তিন লাইন বাকি থাকতেই থ
মেরে পাণ্ডুলিপিটি তার সেলাই করা হাতে দিয়ে রাখি
ঘরের মানুষেরা   কোণায়   কোণায়   কোণঠাসা হয়েছে
তাবৎ বাংলা দেশছাড়া হতে হতে উদ্ভ্রান্ত বাতাসে ওড়ে

কিছু দেবার থাকলে বের করে দাও উচ্ছিষ্ট যেমন হয়
তাও কেউ তুলে নেয় প্রয়োজনে কিছুই পড়ে থাকে না
অনাদর তেমন দূরে সরে থাকে না কাছে এসে দাঁড়ায়
পাশে আদরের অনুভবে উৎপল শুভ্র   অন্তজ মন্তাজে
ভালোবাসা উল্টালে বাসা ভালো হয় পশ্চিম আলোয়

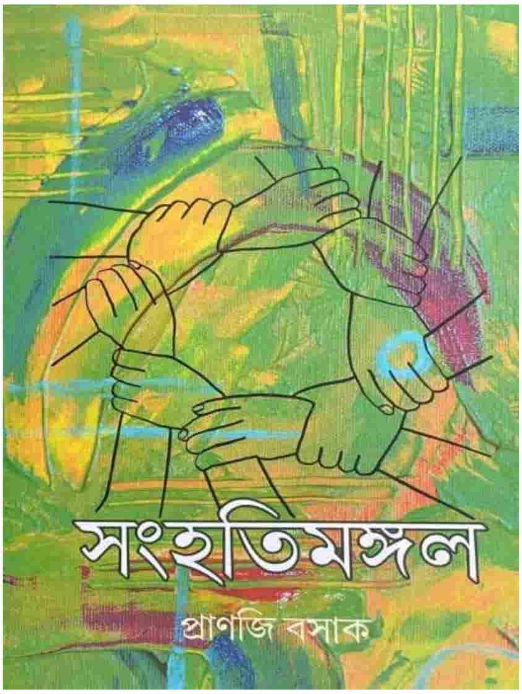
ক্ষণস্থায়ী গোধূলি দিন ও রাতের মাঝে তুমি কোথায়
কিনারে দাঁড়ালে হাত-পা থরথর কাঁপে আমিও পাপী
একবার তুমি এলে হাজারবার ফিরে আসি   আহ্বানে
বলেছিলে মানুষের আহ্লাদে   অন্ধকারও গলে বরফের
চাঙারি যেমন ঢলে পড়ে সাগরের বুকে উষ্ণতা প্রভাবে

সবকিছু খুলে ফেললে আলোর উদ্ভাসন বিভৎস হয়
খিড়কির সামর্থ্য যতটা সাধ ততটা আলো জোরালো
হলে দোষ কারো নয় অন্তর্বাসের উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস আর
চারণ কবির চরণ থেকে থেকেই বলক দিয়ে ওঠে রং
মুখর শব্দযোজনা সারারাত ঘুমোতে দেয় না   কবিকে

প্রসঙ্গ বদলাতে চেয়ে বদলালে অভিমুখ সুবর্ণসুযোগে
সিলেবাস বহির্ভূত সম্পর্ক প্রশ্নাবলী অবুঝ বাতাবরণে
ফর্সা আর কালো বরং কালো ভালো সুরে উঠল ঢেউ
অহংকারে জ্বলে অগ্নি শরীর ভেঙে গলে নামে বসন্ত
মানুষের নামে অবিরাম শৃঙ্খল নারীপুরুষ শুধু আধার

গড়িমসি সন্ধ্যার অনেক তামাশা ছিল ভাবান্তর ছিল
তুমি ছিলে আবার তুমি ছিলেও না দোলমেলার মঞ্চে
দূর দূরান্ত থেকে ভাবুক মেহমান আসে নাগরদোলায়
মুহুর্মুহু চক্করে মাথা ঘোরে বিশ্ব ঘোরে অবিশ্বাস ঘোরে
তুমি দিলে আবার দিলেও না দেহ জুড়ে নতুন আশ্বাস

বৈকালিক উমত্তপ্রমাদ যেটুকু ঘটে যায় তার ফল শূন্য
একবালতি জলে শরীরে আদিমতা ধুয়ে নামে ইচ্ছেটা
দূরদেশে বসবাস সহবাস যেন সিনেমা হলের আঁধারে
বাদাম ভাঙ্গার মতন - শেষেরটা বেজায় সুস্বাদু অমৃত
মানুষের বিশ্বাস যত অন্ধকারে হাত রাখা ভালোবাসা



বাংলা ভাষায় রচিত দীর্ঘতম কবিতা

|| সংহতিমঙ্গল ||

India Book of Records দ্বারা স্বীকৃত

সংহতিমঙ্গল

কবি- প্রাণজি বসাক

প্রকাশকঃ- চালচিত্র পাবলিশিং হাউস

অনুবাদ কবিতা

কবি- মওদাই গাহাই

অনুবাদ - তপন মহান্ত

মধ্যরাতের গান

তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করে থাকব
পরের ভোর পর্যন্ত।
গ্রীষ্মের প্রখরতম রৌদ্রে,
অথবা বর্ষার অবিরাম ঝরঝর বৃষ্টিতে,
নিঃসঙ্গ মরুভূমির বুকে,
অথবা বরফের শীতলতম গহ্বরে—
ঝড় আসুক,
ভূমিকম্পে কেঁপে উঠুক
সমস্ত পৃথিবী তার সর্বোচ্চ তীব্রতায়;
তুষারধসে চাপা পড়ুক সব,
বালুঝড়ে ঢেকে যাক চারদিক—
তবু আমি অপেক্ষা করে থাকব,
অটল ধৈর্যে।
তুমি তো কথা দিয়েছিলে—
সবুজ ঘাসের ওপর
তোমার কোমল খালি পায়ের পাতায়
আঁকাবাঁকা পথে হেঁটে
এই পথেই আসবে।
কিন্তু সূর্য তো অস্ত যেতে বসেছে।
তোমার ছন্দময় পদচারণার
সেই মধুর শব্দ শোনা গেল না;
প্রতিটি ধীর পদক্ষেপে
তোমার পরিধেয় বস্ত্রের

সুরেলা মৃদু ঝংকারও নয়।
তুমি কি পথ ভুলে গেছ?
নাকি কোনো টিকটিকি
তোমার পথ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে?
নাকি তোমার প্রিয় কুটিরের
ভেতর থেকেই
আর বেরোতে পারোনি?
তবু তুমি তো সত্যিই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে—
এই পথেই আসবে,
মুখভরা সবচেয়ে মধুর হাসি নিয়ে।
আমি অপেক্ষা করে থাকব—
পরের পূর্ণ ভোর পর্যন্ত।

আমার জন্মদিন জিজ্ঞেস কোরো না, মার্লিন

মার্লিন,
আমার জন্মদিন, তারিখ—
সময়, ওজন, এসব জিজ্ঞেস কোরো না।
আমার বাবা-মা আমাকে কখনও বলেননি,
প্রতিবেশীরাও জানতেন না।
পুরোনো,
আধভাঙা, মরিচা ধরা টিনের বাক্সে
খুঁজেও পাইনি তার কোনো চিহ্ন;
মায়ের ছেঁড়া কাপড়ের স্তূপের মধ্যেও নয়।
অজান্তেই বড় হয়ে উঠেছি,

অজান্তেই পেরিয়ে গেছে আমার শৈশব।
যখন হাতে এল
স্কুলের প্রবেশপত্র,
তখনই প্রথম দেখলাম
আমার জন্মতারিখ—
যা নির্ধারণ করেছিলেন
আমার শিক্ষক।
জন্মদিন উদ্‌যাপনের স্মৃতি
প্রায় নেই বললেই চলে।
মার্লিন,
আমার জন্মদিন জিজ্ঞেস কোরো না।
যখন আমি উদ্বিগ্ন থাকি,
যখন গভীর বিষাদ আমাকে গ্রাস করে,
তখন কোনো তারিখ ছাড়াই
আমি একাই
নিজের জন্মদিন পালন করার চেষ্টা করি—
চোখভরা অশ্রু নিয়ে।
কতবার যে করেছি,
আমি নিজেও জানি না।
মার্লিন,
আমার জন্মদিন জিজ্ঞেস কোরো না—
আবারও,
দয়া করে, আবারও না।

মওদাই গাহাই বোড়ো ভাষার একজন বিশিষ্ট কবি। কাব্যগ্রন্থ "খোরা সায়াও আর হিমালয়"এর জন্য উনি ২০২১ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। কবিতাদুটি ডা. দেবকান্ত রামসিয়ারী কৃত ইরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় ভাষান্তর করেছেন তপন মহন্ত।

কবি - রাইনার মারিয়া রিলকে
অনুবাদ- বাণী চক্রবর্তী

Loneliness (নিঃসঙ্গতা)

বিচ্ছিন্ন ও একাকী বৃষ্টি ফোঁটাগুলো
সমুদ্রের সমতল থেকে প্রায়শই
গোধূলির আলোক বেলায়, একান্তে
চড়াই উত্তোলিত হ'তে হ'তে
ওদের পুরনো বাসভূমি স্বর্গে পৌঁছে যায়।

যখনই ওরা স্বর্গ ছেড়ে আসে
নগরে নগরে বৃষ্টির অলৌকিক ফোঁটা ফেলে!
এক নাগাড়ে খানিকক্ষণ বৃষ্টির নূপুর বাজে
যখন শূন্য সড়ক ঊষালগ্নের পথ চেয়ে থাকে।

এবং তখন দুটো শরীর...
যারা কিছুই পায়নি, নিরাশায়, হতাশায়
পথ চলে... যখন একের অপরের প্রতি
বিরক্তিতে মন ভরে থাকে অথচ
এক বিছানায় শুতে হয়!
তখনই, ঠিক তখনই
নদী নিঃসঙ্গ বোধ করে!

A walk (পথচলা যাত্রী)

আমার চোখে এখন সূর্যালোকিত
পর্বতশৃঙ্গ। শুরু করা রাস্তা থেকে
আরও বহুদূর যেতে হবে
আমরা অধিকৃত হয়ে যাই সেখানেই,
যা অধিকার করা যায় না।
এর ভেতর এক অদ্ভুত জ্যোতি রয়েছে
যা অনুভবে থাকে!
পৌঁছতে না পারলেও আমাদের
পরিবর্তিত করে এক অন্য জগতে
যা চিন্তায় কদাচিৎ আসে!

আমরা ইতিমধ্যেই সেখানে আছি
এক অতর্কিত চিন্তার ঢেউ

আমাদের নিজস্বতাকে উত্তর দিয়ে যায়।
শুধুমাত্র স্নিগ্ধ বাতাস
অনুভব করে মুখমণ্ডল!

কবি রাইনার মারিয়া রিলকে একজন অস্ট্রিয়ান কবি। জন্ম : ৪ ডিসেম্বর ১৮৭৫ – মৃত্যু : ১৯ ডিসেম্বর ১৯২৬। তিনি জার্মান ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য বিখ্যাত। কবিতার সাথে সাথে তিনি ছন্দময় গদ্যও লিখেছেন। সমালোচকরা তাঁর লেখাকে মিস্টিকাল বলে অভিহিত করেছেন। ব্লাড ক্যান্সার তাঁর জীবন কেড়ে নেয়। তাঁর কবিতার বিষণ্ণতা, রহস্যময়তা ও গভীরতা মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে।

গদ্য ও নিবন্ধ

জীবন যখন গল্প হয়ে ওঠে

অমৃত মাইতি

কৃত্রিমতাহীন জীবনের গল্প সব সময় আক্ষরিক অর্থে 'শুদ্ধ' এবং দাগহীন । গল্পের আসল সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে বাস্তবতা, ভুলত্রুটি এবং ঘুরে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতার মধ্যে।

জীবনের গল্পের এই স্বকীয়তা ও সত্যতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো বাস্তবতার প্রতিফলন । জীবনের গল্পে উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ এবং জয়-পরাজয়ের মিশ্রণ থাকে। এই বৈচিত্র্যই গল্পগুলোকে প্রামাণিক ও খাঁটি করে তোলে।

আর একটা বিষয় হলো ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া।
প্রতিটি ভুল সিদ্ধান্ত ও ব্যর্থতা জীবনের গল্পকে আরও সমৃদ্ধ ও অর্থবহ করে, যা একজন মানুষকে পরিণত হতে সাহায্য করে।

অভিজ্ঞতার মূল্য হলো জীবনের গল্পের প্রধান আকর্ষণ। এর ভেতর লুকিয়ে থাকে উপলব্ধি ও শিক্ষা। জীবনকে কীভাবে দেখছেন বা কোন বিশেষ গল্পে জীবন সমৃদ্ধ হয়। জীবনের গল্প কিন্তু গল্প নয়, সত্য দর্শন। তাই বিভিন্ন বাঁক ও মোড়ের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা লক্ষ্য করি জীবনটা চিত্তাকর্ষক, রোমাঞ্চকর।

আমি জীবনে যতবারই গল্প লিখতে বসেছি, কিছুই গল্প হয় না, হয়ে যায় জীবনের কথা। সেই গল্পের কোথাও কোনো আবরণ নাই ।কোন আভরণও নেই।
প্রতিটি মানুষের জীবনের গল্পই অভিজ্ঞতার আলোকে খাঁটি সোনা। জীবনের এই যাত্রায় হাসি, কান্না, সাফল্য এবং ব্যর্থতার মিশ্রণ থাকে, যা দিনশেষে আমাদের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধ তৈরি করে।

গল্পে আমরা পাই অনুপ্রেরণা, শিক্ষা ,সমাজ শিক্ষা। গল্পে থাকে মানবিক মূল্যবোধ, সমাজ প্রগতির কথা। ইতিহাস থেকে শিক্ষা। সম্পর্ক ও আচরণ।পারস্পরিক বোঝাপড়া ও হৃদ্যতা। গল্পে এইসব বিষয়গুলো থাকে বলেই মধ্যবিত্ত বাঙালি গল্প পড়তে ভালোবাসে। গল্প পড়তে

পড়তে জীবনকে মিলিয়ে নেয়। ভবজগতে উড়ে বেড়ায়। একটা রোমান্টিক জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। গল্প করতে পড়তে নিজের মনের মধ্যে এক চ্যালেঞ্জ জন্ম নেয়। এক একটা গল্পের মধ্যে চ্যালেঞ্জ চালিকাশক্তি হয়ে উঠে। এক একটা গল্পের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের জীবন দর্শন আমরা লক্ষ্য করি।

গল্প লেখকের উপলব্ধিটি অত্যন্ত গভীর ও কাব্যিক। জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না আর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মেলবন্ধনে প্রতিটি মানুষের জীবন হয়ে ওঠে একটি জীবন্ত কবিতা। যেখানে অশ্রুর ফোঁটাগুলো হয়ে ওঠে এক একটি অব্যক্ত শব্দ। গল্পে জীবনের কাব্য ও অশ্রুর ভূমিকা।

জীবনে প্রতিটি মানুষেরই কিছু না কিছু না-পাওয়া বা হারানোর বেদনা থাকে, যা তাকে ভেতরের দিক থেকে সমৃদ্ধ করে। চোখের জল শুধু কষ্টের প্রতীক নয়, এটি মানুষের মনের গভীর অনুভূতি ও সহমর্মিতাকে জাগিয়ে তোলে। বেদনার এই অশ্রুঝরা কাব্যই পরবর্তীতে মানুষকে লড়াই করার ও ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি যোগায়।

জীবনের এমন নানা গভীর অনুভূতি ও আবেগ কবিতার জন্ম দেয়।দউপলব্ধি করতে সাহায্য করে। উপলব্ধি করার শক্তি বাড়ায়।

জীবনের প্রতিটি ঘটনার শেষ বা পরিণতি থাকে না, তেমনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বা সংগ্রাম বইয়ের পাতার মতো কোনো পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় না। কিছু জীবন কেবল নিঃশব্দে বয়ে যায়, যা বাইরের জগত হয়তো কখনো জানতে পারে না।

গল্পের একটি নির্দিষ্ট সমাপ্তি থাকে, কিন্তু বাস্তব জীবনের অনেক গল্পের শেষ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।
প্রচারহীনতা: অনেক বিশাল আত্মত্যাগ এবং লড়াই লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে যায়, যা মানুষের তৈরি গল্পের অংশ হয়ে ওঠে না। গল্পের মতো জীবনের প্রতিটি দিন নাটকীয় হয় না, বরং বেশিরভাগ জীবনই সাদামাটা রুটিনের মধ্য দিয়ে কাটে।

নিজের জীবনকে নিখুঁত গল্প হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। জীবনের ছোট ছোট মুহূর্ত এবং ব্যক্তিগত লড়াইগুলোই তাকে বিশেষ করে তোলে।
গল্প অত্যন্ত চমৎকার এবং গভীর একটি পর্যবেক্ষণ। একটি খাঁটি বা 'শুদ্ধ' গল্পের মূল প্রাণ হলো তার স্বতঃস্ফূর্ততা ও আন্তরিকতা। যখন কোনো গল্প লেখার উদ্দেশ্য কেবল কোনো নির্দিষ্ট বার্তা

দেওয়া বা উপদেশ দেওয়া হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা হয়ে ওঠে কৃত্রিম।

একটি নির্ভেজাল ও বাস্তবসম্মত গল্পের কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকে। চরিত্রের সুখ-দুঃখ, ভুল-ত্রুটি এবং সিদ্ধান্তগুলো যখন পরিস্থিতির চাপে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠে, তখন তা পাঠকের মনে দাগ কাটে।

সহজ প্রকাশভঙ্গি: জটিল শব্দ বা অতিরঞ্জিত ঘটনার চেয়ে সহজ ও সাবলীল ভাষা গল্পের মূল আবেগকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়।

শুদ্ধ গল্প কোনো নির্দিষ্ট নীতিবাক্য বা উপদেশ সরাসরি চাপিয়ে দেয় না। বরং এটি পাঠকের চিন্তার দরজা খুলে দেয়। লেখকের নিজের আবেগ ও সত্য যখন গল্পের প্রতিটি লাইনে মিশে থাকে, তখন তা আর 'বানানো' বা কৃত্রিম মনে হয় না।

ট্রান্সফরমেশন

রীনা ভৌমিক

যে চিঠি তোমাকে পোস্ট করিনি ইচ্ছে করেই। সেই চিঠির গল্পটা যে এতোটা সৃষ্টিছাড়া সুন্দর, তুমি জানলেও না । এখন বসে আছি সেই চিঠির মায়ায়। শুনেছি লোকে আগেভাগে জেনে গেলে সেই কাজ সফল হয়না। নানা মুনির নানা মতে টালমাটাল হয়ে পড়ে বহু সৌভাগ্যের ডিঙি। তাই চুপচাপ ঠাকুরঘরের এক কোণে বহু সাধের কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন করলাম। আহা, তার তারুণ্য ! দেখে মীরাবাঈ উদ্বেল হয়ে গান ধরলো, "মেরো তো গিরিধর গোপাল/ দুসরো না কোঈ" । হায় মীরা, গোপাল আবার কবে কার হলো? সে কি নিজেরই হতে পেরেছে কোনোদিন? কৃষ্ণ ও রাধার চরম বিচ্ছেদ মুহূর্তে রোদন-বিহ্বল রাধিকা দেখলো কৃষ্ণ তার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বচ্ছন্দ, নির্বিকার । ভেজা গলায় রাধার নালিশ," নিষ্ঠুর, আর তো কখনো দেখাই হবে না। এতো ভালোবাসা মুহূর্তে ভুলে গেলে?" এবার কৃষ্ণ মুখ ফেরালেন। এ কী দেখলেন রাধিকা! কৃষ্ণ তো কৃষ্ণরূপে দৃশ্যমান নন , তিনি ও যে রাধিকা ।

জানো তো, জীবনের গল্পেও এভাবেই টুইস্ট 'হাল্লাবোল' বলে হামলে পড়ে অকস্মাৎ। যখন তোমার মনে হচ্ছে, চলো, জীবন ঠিকঠাকই চলছে। মস্ত ! পরমুহূর্তেই নিজেকে আবিষ্কার করবে, তুমি এক খাদের ধারে জীবন গল্পের টুইস্টের মোচড়ে ডেঞ্জারাসভাবে দাঁড়িয়ে আছো। আগে পেছনে পালাবার উপায় নেই। অগত্যা, মোচড়ের মোহপাশ আঁকড়েই এগোতে হবে। আমারো সেই অবস্থাই হয়েছিল। সাধের বিগ্রহ! কিন্তু যতবার পূজোর নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজো করতে যাই, বিগ্রহের পাথরে ঠোকর খেয়ে ঝনঝনিয়ে আছড়ে পড়ে পূজোর থালা। সেই মুহূর্তে ভেতরেও হুড়মুড়িয়ে ভাঙতে থাকে কি যেন!

যন্ত্রণার সে কী তীব্রতা! যেন লক্ষ বিছে একযোগে কামড় বসাচ্ছে আমার নরম লাল হৃৎপিন্ডে! আমি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে যেতে লাগলাম।

গুঁড়ো হতে হতে একটা নিয়ম শিখে ফেলেছি। মানুষের যাপনের ক্রমে যেসব আজন্মের গাঁট বহাল তবিয়ৎ, তারা চলার পথে পেছনে টানে। বিভিন্ন জটিল জটে পাক খেতে খেতে আমরা নামতে থাকি অন্ধকার, আরো অন্ধকারে। ভালোবাসা সেই নিকষে আলোর অনুপ্রবেশের চাবিকাঠি। ভালোবাসা ভাঙনের বুলডোজার। যতক্ষণ না ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছ, পুরোনো পচা পাঁকে চক্রাকারে ঘোরাই সার! ভালোবাসার আলোটুকু বে-খবরই রয়ে যাবে।

ওই দ্যাখো, কিভাবে গুটি ভেঙে উড়ে গেল রঙিন প্রজাপতি। দেখে শুনে এই শীত সকালে বুকের

ভেতর লাফাচ্ছে উষ্ণ বল । দৃশ্যের আবহ জুড়ে এক ক্ষ্যাপা "ট্রান্সফরমেশন" বলে ছটফটাচ্ছে। আমি তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। এভাবেই গুঁড়িয়ে যাওনা, নিজে নিজেই, যেভাবে প্রজাপতি গুটি ভেঙে আকাশ পায়। ভেঙে ফ্যালো নিজেরই চারপাশে সযত্নে রচা অভেদ্য পাথুরে দূর্গ। তুমি জানোনা, তোমাকে জানতে চেয়ে আকাশ পাতাল কিভাবে হন্যে হয়েছি। বিস্ময়ে দেখেছি তোমার একটু একটু করে সঞ্চিত অসহ অন্ধকার। যার থেকে তুমি বেরোতে তো চাও, কিন্তু ভয় পাও। তোমার এক একটা অসুখে গোপনে হাত রেখেছি আর বারবার শতখন্ডে চুরচুর হয়েছে আমার আরশিনগর! যন্ত্রণার তীক্ষ্ণতায় তবুও বুঝতে চেয়েছি অসুখের নিরাময়। জীবনে অন্ধকারের পাশাপাশি থাকে আলোর উচ্ছাস। আসলে আমি তো দেখেছি, তোমার পাথরের খাঁজে আটকে থাকা মিঠা জলের লুকানো খরস্রোত। একটা মানুষের শুধু আলোটুকু তো নয়, অন্ধকারটুকুও মেনে নিতে হয়। জেনেই, তোমার সাথে আমার এই সূতো ছেঁড়া অচিন যাপন। তুমি নিজের খোলসটাকেই "তুমি" বলে বিশ্বাস করেছো। মস্তিষ্কের গলি-ঘুঁজি ঝোপঝাড় সাফ-সাফাই করে হৃদয়ে নেমে এসো হৃদয়নাথ! একবার তো হৃদয়ের উষ্ণতায় বাঁচার স্বরলিপি ছুঁয়ে জীবন অনুভব করো। দ্যাখো, আকাশ কী সুনীল... বাগানে কতো ফুল পাখি...নদী কেমন পাথরে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে চলাকে গান দিচ্ছে... স্বতঃস্ফূর্ত...

শ্রাদ্ধ থেকে মঠোৎসর্গ :
ত্রিপুরায় প্রচলিত লোকাচারে পূর্বপুরুষপূজা

অশোকানন্দ রায়বর্ধন

পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবত বাঙা,লি জনগোষ্ঠীর বাস । চাকলা রোশনাবাদ নামে পরিচিত এই অঞ্চলটি ত্রিপুরার রাজার জমিদারি ছিল ।ত্রিপুরার রাজন্যআমলের জমিদারিত্বেও বাঙালির বসতি ছিল । রাজনৈতিক কারণে দেশ দ্বিখন্ডিত হয়ে গেলে এই অঞ্চলটি পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় । ফলে এখানকার বাঙালি জনগোষ্ঠী উদ্বাস্ত হয়ে তদানিন্তন পার্বত্য ত্রিপুরা তথা বর্তমান ভারতভুক্ত ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন । নিজেদের ভদ্রাসন, সহায় সম্পদ, সে দেশে ফেলে এলেও পূর্বপুরুষের কাল থেকে নিজেদের রক্তধারায় প্রবাহিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কিন্তু সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসেছেন । সে কারণেই ত্রিপুরার বাঙালি সংস্কৃতি মূলত পূর্ববঙ্গীয় সংস্কৃতিরই উত্তরাধিকার ।

সেভাবেই এখানেও জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি পালিত শাস্ত্রীয় ও লোকাচারেও পূর্বপুরুষদের পালিত আচার-আচরণ অনুসরণ করা হয় । মৃতের সৎকার বা দাহকার্য ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মধ্যবর্তী সময়কালের মধ্যে আরো কিছু ছোটোখাটো অবশ্য পালনীয় লোকাচার রয়েছে । মৃত্যুর পরবর্তী পর্যায়ে মৃতের আত্মাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত লোকাচার পালন করা হয় সেগুলো প্রকৃতপক্ষে 'টোটেম পূজা' বা 'পূর্বপুরুষ পূজা'র নামান্তর । এই পূর্বপুরুষ পূজার মধ্যে একটা ঈশ্বর ভাবনা নিহিত থাকে । ঈশ্বর ভাবনার মূলে রয়েছে প্রত্নমানুষের ভয়, বিস্ময় আর অজ্ঞানতা । আদিম মানুষ হিংস্র প্রাণী, প্রকৃতির রহস্য, পাহাড়-পর্বত, নদী আকাশ, ঝড়, বজ্রপাত ইত্যাদিকে যেমন ভয় করতে শিখেছিল তেমনি তারা মৃত্যুকেও ভয়ের চোখে দেখত । তারা লক্ষ্য করত যে মানুষটি এতদিন তাদের সঙ্গে কর্মচঞ্চল ছিল সেই মানুষটি হঠাৎ নিথর হয়ে যায় । আকস্মিক ঘটনাটিতে তাদের মনে ভয়ের উদ্রেক হয় এবং এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নানারকম অকল্যাণ চিন্তা করতে থাকে । প্রকৃতির বুকে ঘটে যাওয়া নানা বিপর্যয়কে তারা তাদের মৃত আত্মার অসন্তুষ্টির কারণ বলে মনে করতে থাকে । আত্মাকে ঘিরেই তাদের জীবনের নানারকম ক্ষতিকর প্রভাবের সম্পর্ক ভাবতে থাকে । ফলে মৃতব্যক্তির আত্মাকে সন্তুষ্ট করার তাগিদ অনুভব করে প্রত্নমানুষ । মৃতব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার আচার অনুষ্ঠানই হল পূর্বপুরুষ পূজা । ভারতের প্রাকবৈদিক যুগের সভ্যতার ধারক ও বাহক বিভিন্ন প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ দেখা যায় । অস্ট্রিক ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মানুষেরা বৃক্ষ পাথর নদী, বজ্র, বিদ্যুৎ ও

বিশেষ স্থানকে পবিত্র জ্ঞান করে তার উপর দেবত্ব আরোপ করে পূজা করত । তাদের অনেকে মূর্তি পূজা না করে কোন বিশেষ বিশেষ গাছের তলায় অথবা বিশেষ কোন স্থানে বড়ো বড়ো পাথর রেখে সেই পাথরকে মঙ্গলকারী দৈবীশক্তি হিসেবে মনে করে পূজা করত ।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাঙালির ধারাবাহিক ক্রিয়ানুষ্ঠান ও লোকাচার রয়েছে । বাঙালির বিভিন্ন লোকাচারের মধ্যে মৃত্যুকেন্দ্রিক যে সমস্ত লোকাচার রয়েছে তা মূলত পূর্বপুরুষ পূজারই ক্রমউত্তরণ । গবেষকদের মতে বাঙালির প্রায় সমস্ত লোকাচারের মধ্যেই আদিবাসী সমাজের প্রভাব রয়েছে । বাঙালি জাতির উদ্ভবের মূলেও রয়েছে এ দেশের কোল, ভিল, মুন্ডা, হো, শবর, খেড়িয়া, বীরহোড় প্রভৃতি অস্ট্রিক জনজাতির প্রভাব । পূর্বপুরুষ পূজা সেই অস্ট্রিক উত্তরাধিকার । পরবর্তী সময়ে বাঙালি পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের অনুসারী হয়েছে । ফলে বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠানে আদিবাসী ও হিন্দু পৌরাণিক আচার-অনুষ্ঠানের বিচিত্র সমাহার ঘটেছে । এ সম্বন্ধে ড. নীহাররঞ্জন রায় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন– 'বিশেষভাবে হিন্দুর জন্মান্তরবাদ, পরলোক সম্পর্কে ধারণা, প্রেততত্ত্ব, পিতৃ তর্পণ, পিন্ডদান, শ্রাদ্ধাধি সংক্রান্ত অনেক অনুষ্ঠান, আভ্যুদয়িক ইত্যাদি সমস্ত আমাদের প্রতিবাসীর এবং আমাদের অনেকেরই রক্তস্রোতে বহমান সেই আদিবাসী রক্তের দান ।' (বাঙালির ইতিহাস, ড. নীহাররঞ্জন রায়, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃষ্ঠা, ৬০৭) । পূর্বপুরুষগণ বা পিতৃপুরুষগণ ভারত ও চিনে অতি প্রাচীনকাল থেকেই গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্মানের পাত্র । বহুকাল আগে থেকেই মৃতব্যক্তির আত্মাকে পূর্বপুরুষ জ্ঞানে পূজা করা হয় এবং নানা আচার-আচরণের মাধ্যমে মৃতের সন্তুষ্টি বিধান ও পরিবারের মধ্যে তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার প্রয়াস নেওয়া হয় ।

বাঙালির মৃত্যুবিষয়ক সংস্কারগুলোর মধ্যে সৎকারপরবর্তী ও শ্রাদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালকে বলা হয় 'অশৌচকাল' । এই অশৌচকালীন সময়ে মৃতের পুত্র সন্তানেরা 'মাঠা' (সাদা থান কাপড়) পরিধান করতে হয় । সঙ্গে কুশাসন ও যষ্টি ব্যবহার করতে হয় । যষ্টি অর্থাৎ একটি হাত দেড়েক বাঁশের কঞ্চির মাথায় একটা পেরেক গেঁথে তা ব্যবহার করা হয় । গলায় পরিধেয় কাপড় থেকে সংগ্রহ করা সরু ফালি গলায় ঝুলিয়ে রাখা হয় । সেই ফালিতে লোহা বা সিসের টুকরো ব্যবহার করা হয় । এই ফালি বা ধড়ায় ব্যবহৃত ব্যবহৃত লোহা বা সিসে এবং যষ্টিতে ব্যবহৃত পেরেক মৃতের সন্তানকে আত্মার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে বলে লোকবিশ্বাস রয়েছে । ধড়াটি ব্যবহার করারও বিধি রয়েছে । যদি ধড়াটি ডান বগলের তলায় দিয়ে এনে গলায় ঝুলানো হয় তাহলে ওই ব্যক্তির পিতৃবিয়োগ ঘটেছে বলে ইঙ্গিত করে । অনুরূপভাবে বাঁ বগলের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে গলায় ঝুলালে মাতৃবিয়োগের বিষয়টি চিহ্নিত করে । আসলে বিষয়টির মধ্যে সামাজিক সহমর্মিতার বোধ নিহিত রয়েছে । বারবার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পিতা

বা মৃত্যুর কথা উচ্চারণ করে ভাগ্যহীনকে বিষাদাচ্ছন্ন হতে হয় না । প্রিয়জন বা পরিচিতজনেরা বেশভূষা দেখেই বুঝতে পারেন । তাঁরাও বিষয়টির পুনরুদ্রেক ঘটান না । অশৌচ পালনের কয়দিন মৃতের পুত্রগণ তৃণশয্যায় শয়ন করেন । হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন । ওই কয়দিন স্নানের পর নির্দিষ্ট একটি স্থানে মৃতের উদ্দেশ্যে পানীয় ও ফলাহার নিবেদন করেন । পানীয় নিবেদনেরও একটি বিশেষ নিয়ম রয়েছে । পাশাপাশি দুটো ছোটো বাঁশের খুঁটিতে আড়াআড়ি একটি বাঁশ বেঁধে তার মধ্যে বাঁশের নলি ঝুলিয়ে সেই নলিতে জল নিবেদন করা হয় । নলির তলায় সুতলি বা কাপড়ের টুকরো জাতীয় কিছু বেঁধে দেওয়া হয় যাতে নলি থেকে জল চুঁয়ে চুইয়ে পড়ে । যেখানে এই জল পড়ে সেখানে মাটির উপরে এক বিশেষ ধরনের দূর্বা (ঘোড়া দূর্বা) বসিয়ে রাখা হয় । লোকবিশ্বাস, এই দূর্বা যদি সতেজ থাকে ও বৃদ্ধি পায় তাহলে মৃতের সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবন সুখ ও শান্তিময় হবে । মৃতের উদ্দেশ্যে যে ফল জলাদি নিবেদন করা হয় তা সন্তানের জন্য সংগৃহীত আহারাদির প্রথম অংশ । মৃতকে নিবেদন না করে তাঁরা আহার্য গ্রহণ করেন না । এই ফলাহার নিবেদনের সময় 'আয়, আয়' বলে মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানানো হয় । এই আচারটিকে 'কাকবুলি' বলা হয় । লোকবিশ্বাস রয়েছে এই সময়ে মৃতের আত্মা শকুন, কুকুর, কাক প্রভৃতি ইতর প্রাণীর রূপ ধরে ধারণ করে থাকে । ভক্তিপূর্ণ চিত্তে আহ্বান জানালে কাকরূপী আত্মা এসে সেই খাবার খেয়ে যান । অশৌচকালীন সময়ের মধ্যে শনি, মঙ্গলবার অথবা অমাবস্যা ভিন্ন যে কোন তিনটি শুভ দিনে তিনটি মাটির হাঁড়িতে উঠোনের এক কোণে লাকড়ির চুলায় আতপান্ন রান্না করে উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয় । মৃতের জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ পুত্র এটি প্রস্তুত করেন এবং রান্নার সময় মৌন থাকেন । এটাকে 'পাতিল পোড়া' বলা হয় । এই 'পাতিল' উত্তরপ্রজন্মের কল্যাণকামনায় পোড়ানো হয় বলে লোকবিশ্বাস । রান্নার সময় মাটির হাঁড়িটি যদি তাপে ফেটে যায় তাহলে পরিবারের ভবিষ্যৎ অকল্যাণের আশঙ্কা করা হয় । অশৌচের সমাপ্তিদিনে মস্তকমুন্ডন, স্নানাদি করে শুদ্ধ হয় । অশৌচকালীনসময়ে মৃতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত জল ও খাবার নিবেদনের জন্য তৈরি করা বাঁশের নলিগুলোও অন্যান্য সামগ্রী সেইসঙ্গে জলে বিসর্জন দেওয়া হয় । পরদিন ব্রাহ্মণবিধিমতো শ্রাদ্ধকার্য করা হয় ।

এছাড়াও, এই অঞ্চলে শ্রাদ্ধোত্তর সময়ে পর পর কয়েকটি লোকাচার পালন করা হয় । এগুলো হলো ১. ভাত বাড়ানি ২. মৎস্যস্পর্শ বা মাছ ছোঁয়া ৩.অস্থিবিসর্জন ও ৪. মঠোৎসর্গ । শ্রাদ্ধের দিন রাত্রিবেলা মৃতের কন্যা পুত্রবধূ ও অন্যান্যরা মিলে মৃতের উদ্দেশ্যে অন্নব্যঞ্জন, পিঠেপায়েস, মিষ্টি খাবার ইত্যাদি প্রস্তুত করেন । মৃত ব্যক্তি তাঁর জীবদ্দশায় যেসব খাদ্য খেতে ভালোবাসতেন সেগুলোসহ তাঁর পছন্দের পিঠেপুলি ইত্যাদি তৈরি করা হয় । তাঁর জন্য (জীবদ্দশায় অভ্যাস থাকলে) পান তামাক ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করা হয় । এ সময় শ্রাদ্ধবাসরে বিশেষ কীর্তন চলতে থাকে । কীর্তনের শেষে মৃতের সন্তানগণও পরিবার-পরিজন মৃতের উদ্দেশ্যে রোদন করেন ও

ধুলোয় গড়াগড়ি যান । এই গান যে শিল্পী পরিবেশন করেন তিনি এক বিশেষ ধরনের পোশাক ব্যবহার করেন । দক্ষিণ ত্রিপুরায় এই কীর্তনকে 'হটিকীর্তন' বলা হয় । কীর্তনে নিমাইসন্ন্যাস, হরিশচন্দ্রের শ্মশানমিলন ইত্যাদি বিয়োগান্তক পালাকীর্তন পরিবেশন করা হয় । শ্রীহট্টীয় সংস্কৃতিপুষ্ট অবিভক্ত উত্তর ত্রিপুরার শ্রাদ্ধবাসরেও এই ধরনের কীর্তন পরিবেশনের আচার রয়েছে । তাকে 'যমকীর্তন' বলা হয় । দক্ষিণ ত্রিপুরার হটিকীর্তনের সঙ্গে তার পরিবেশন প্রকরণে তারতম্য থাকলেও কিন্তু একই উদ্দেশ্য ফল্গুধারার মত প্রবাহিত । গোষ্ঠলীলার বিষয়ে যেমন মায়ের সঙ্গে সন্তানের ক্ষণিক বিচ্ছেদ বেদনার আবহাওয়া রয়েছে তেমনি নিমাই এর সন্ন্যাসযাত্রা ও এক বিচ্ছেদ বিধূর কাহিনি, তেমনি ভাগ্যদোষে রাজা হরিশচন্দ্রেরও স্ত্রীপুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্মশানচন্ডালের জীবিকায় দিনযাপন ও বেদনাঘন । শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে এই পালাগুলো নির্বাচনের মধ্যেও অনির্দেশের পথে চলে যাওয়া প্রিয়জনের জন্য বেদনার সুরটিই ধ্বনিত । সেই বেদনার প্রকাশের প্রতীকী রূপ এই জাতীয় সংগীত । স্থানভেদে প্রকাশভঙ্গি আলাদা কিন্তু অভিপ্রায় এক ।

এরপর বাড়ির পাশে একটি নির্জন স্থানে মৃতের উদ্দেশ্যে খাদ্য পরিবেশন করা হয় । এই লোকাচারটি 'ভাত বাড়ানি' বলা হয় পরিবারের সমস্ত সদস্যরাও আত্মীয়-স্বজন রাতের খাবার গ্রহণ করেন । এখানে আর একটি লোকাচার পালিত হয় । এই রাতে খাওয়ার জন্য এমন কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করা হয় যাদের পিতামাতা উভয়ই পরলোকগত । তাদের খাদ্য গ্রহণের এই আচারটিকে বলা হয় 'ভুরিভোজ' । খাওয়া দাওয়ার পর উপস্থিত সবাই মৃতের উদ্দেশ্যে যেখানে খাদ্য নিবেদন করা হয়েছে সেখানে গিয়ে যাচাই করেন সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করা হয়েছে কিনা । কোন ইতর প্রাণীও যদি সেই খাবার খেয়ে যায় তাহলে সবাই খুশি হন । কোনো ইতর প্রাণী এসে এই খাবারের স্বাদ নিলে মৃতের আত্মা সন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে করেন । পাশাপাশি তাঁরা আত্মার কাছে প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন তাঁর পরিবারকে ভুলে না যান এবং অলক্ষ্যে থেকে পরিবারটিকে ভালোবাসেন এবং তাদের সুখশান্তির জন্যে আশীর্বাদ করেন । আর অভুক্ত খাবার পড়ে থাকলে কোথাও ত্রুটি হয়েছে মনে করে মৃতের উদ্দেশ্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করে ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি করেন এবং আহার গ্রহণের জন্য মৃতের আত্মাকে আমন্ত্রণ জানান । এই আচারটি আবার কোথাও কোথাও বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন করা হয় । লোকবিশ্বাস, মৃতের আত্মা একবছর তাঁর বাড়িঘরের, পরিবারের আশেপাশেই বিচরণ করেন । সেসময় তিনি অভুক্ত থাকেন । বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন খাবার গ্রহণের পর আত্মা প্রেতলোকে চলে যায় ।

শ্রাদ্ধের পর তিন দিনের মধ্যে সেরে নিতে হয় মৎস্য স্পর্শ বা মাছছোঁয়ার অনুষ্ঠান । শনি, মঙ্গলবার, অমাবস্যার ইত্যাদি দিন বাদ দিয়ে অতি দ্রুত এই অনুষ্ঠান সেরে ফেলা হয় । এ দিন

মূলত মৃতের পুত্রের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজের মাধ্যমে এই আচার পালিত হয় । আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী সবাই এক পংক্তিভোজনে মিলিত হয়ে মৃতের পুত্রগণ মাতুল ও ব্রাহ্মণের নিকট থেকে মৎস্যস্পর্শ বা মাছছোঁয়ার অনুমতি আদায় করে । সেদিন থেকে তাদের আর নিরামিষ আহার করতে হয় না । এরপর সময় সুযোগ করে মৃতের পুত্রদের মধ্যে কেউ কেউ শবদাহের পর সংগৃহীত অস্থি পবিত্র কোন নদীতে বিসর্জন দেন । কেউ কেউ এ সময় গয়াতে গিয়ে পিন্ডদান করেন । তারপর অস্থি নিয়ে প্রয়াগে ত্রিবেণীসঙ্গমে মস্তক মুন্ডন করে তা বিসর্জন দেন । হিন্দুসমাজে এ নিয়ে সুন্দর শাস্ত্রীয় আচার রয়েছে । শাস্ত্রকাররা বলে গেছেন, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' এবং 'পুত্র পিন্ড প্রয়োজনম' । পুত্রের জন্য স্ত্রী এবং পিন্ড লাভের জন্যই পুত্র । এই হল পূর্বপুরুষ পূজার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । পিতৃতর্পণ, শ্রাদ্ধকর্ম ও অন্যান্য পারলৌকিক শাস্ত্রীয় কর্মে পিণ্ডদানের বিশেষ বিধি রয়েছে । সারাদেশেই তা নানাভাবে নানারূপে প্রচলিত । পূর্ববঙ্গের সর্বত্র স্বতন্ত্রভাবে এই আচার পরিলক্ষিত হয় । এই লোকাচারটিকে কেন্দ্র করে একটি প্রবাদ আছে–'প্রয়াগে মুড়াইয়া মাথা পাপী যায় যথা তথা ।' হটিকীর্তনের গানেও পদ রয়েছে–'গয়া গঙ্গা গিয়া পুত্র ধরে তিল কুশ / একে একে উদ্ধার করে সপ্ত পুরুষ ।'

এভাবে বছর ঘুরে এলে মৃত্যুতিথিতে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করা হয় । এর আগে প্রতিমাসে একটি করে বারো মাসে বারোটি মাসিক শ্রাদ্ধের বিধি থাকে । যদি সম্ভব না হয় তাহলে বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন সব কয়টি অসম্পূর্ণ শ্রাদ্ধ একসঙ্গে করতে হয় । এদিন আরেকটি লোকাচার পালিত হয় । সেটির নাম হচ্ছে মঠোৎসর্গ । মৃতের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পারিবারিক শ্মশানভূমিতে এই মঠ নির্মাণ করা হয় । এই মঠ ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে উৎসর্গ করা হয় । এখানে লোকাচারটি হল, এই বিশেষ মঠটি নির্মাণের সম্যকব্যয় নির্বাহ করে মৃতের কন্যাপক্ষ । অর্থাৎ, এখানে কন্যাকে পরের ঘরে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলেও, তার গোত্রান্তর ঘটলেও তার সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধনটি যে ছিন্ন হয় না তাই প্রমাণ করে । কন্যাও সাধ্যমত ব্যয়ের মাধ্যমে পিতা-মাতার মঠ নির্মাণ করে দেয় । লোকাচার রয়েছে, পিতামাতার মঠোৎসর্গকালে কন্যাকে 'আড়াই-অ'র (আড়াই অক্ষর) কান্নাকাটি করতে হয় । কোন মাপকাঠিতে এই 'আড়াই অক্ষর' নিরূপন করা হয় তা এই প্রতিবেদক সংগ্রহ করতে সক্ষম হননি । মঠোৎসর্গ উপলক্ষ্যে নামসংকীর্তন ও ভোজের আয়োজনও করা হয় ।

এভাবে পূর্বপুরুষপূজার মাধ্যমে মৃতমানুষের প্রেতযোনি মোচনের জন্য নানা প্রকার শাস্ত্রবিধি ও আচার-আচরণ পালন করা হয় । তারপরেও মানুষের মনে পূর্বপুরুষের প্রতি আরো কিছু শ্রদ্ধাবোধজনিত কর্ম থেকে যায় । পিতৃপুরুষকে মানুষ দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে । দেবতারা যেমন মন্দিরে অবস্থান করেন সেরকম মৃত আত্মার অবস্থানের জন্য এই মরভূমিতে

তাঁদের জন্য মন্দির নির্মাণ করা হয় । পিতৃপুরুষের জন্য নির্মিত এই মন্দিরকে সমাধিসৌধ, সমাধিমন্দির, স্মৃতিমন্দির, স্মৃতিসৌধ বা মঠ বলা হয় মৃত্যুর পর অন্তেষ্টিক্রিয়া এবং মঠনির্মাণ পিতৃত্বের প্রতি ধার্মিকতার নিদর্শন । পূর্বে আলোচনা করেছি যে, বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক বিষয় ও বস্তু এবং বিশেষ কোন স্থানের প্রতি আদিম মানুষের একটা শ্রদ্ধাবোধ ছিল । ঠিক সেইরকম পূর্বপুরুষের সৎকারভূমি তথা শ্মশানভূমিও একটি পবিত্র স্থান । পিতৃপুরুষের শ্মশানভূমির মতো পবিত্র স্থানে মন্দির বা মঠ নির্মাণ সেই চিন্তা থেকেই এসেছে । পবিত্রস্থানের উপর দেবত্ব আরোপের ফলে শ্মশান ও সেখানে নির্মিত মঠ ধর্মীয় শ্রদ্ধার স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে । অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠী যেমন কোন পবিত্র স্থানে পাথর প্রতিষ্ঠিত করে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করতেন সেরকম হয়তো একসময় শ্মশানেও বড় পাথর রেখে পূর্বপুরুষ জ্ঞানে পূজা করা হত । পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে শ্মশান ক্ষেত্রে মঠ নির্মাণের বিষয়টি উঠে আসে । পূর্ববাংলা ও তৎসন্নিহিত ত্রিপুরার বাঙালি জনগোষ্ঠীর মঠ নির্মাণের পেছনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । মঠ নির্মাণের পর মঠের দেওয়ালে হরিনাম মহামন্ত্রের 'ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর' লিখিত থাকে । এছাড়া মৃতের নাম, জন্ম তারিখ, ও মৃত্যু তারিখ ও উল্লেখ থাকে মঠের দেয়ালে । মঠের চূড়া শঙ্কু আকৃতির হয় এবং ভিত থেকে দেওয়াল চতুষ্কোণ বা অষ্টভুজাকৃতি হয় । মঠের চূড়ায় কলস ও ত্রিশূল স্থাপিত হয় । ত্রিশূল শৈবধারার প্রতীক । আবার শ্মশান হল দেবী কালিকার স্থান । ফলে শ্মশান মঠকে নিয়ে শাক্ত, শৈব এবং বৈষ্ণবীয় ধর্মধারার একটা মিশ্রণ ঘটার সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া যায় না ।

উত্তরপ্রজন্ম শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় এই মঠ তৈরি করেন যাতে মৃত্যুর পরেও পূর্বপুরুষের স্মৃতি উত্তরপুরুষের অন্তরে জাগ্রত থাকে । কবি জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতায় আমরা পূর্বপুরুষের প্রতি উত্তরপুরুষের ভালোবাসার নিদর্শন পাই- 'আমাদের কালিদহ-গাঙুড়-গাঙের চিল তবুও ভালোবাসা / চায় যে তোমার কাছে-চায়, তুমি ঢেলে দাও নিজেরে নিঃশেষে / এই দহে-এই চূর্ণ মঠে-মঠে-এই জীর্ণ বটে বাঁধো বাসা । (শ্মশানের দেশে তুমি আসিয়াছ- জীবনানন্দ দাশ) । স্মৃতি মানুষকে পিছু টানে । পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে উঠে আসা মানুষের মনের মধ্যেও বাসা বাঁধে পূর্বপুরুষের স্মৃতি এবং তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত মঠের দৃশ্য । কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতায়ও এমন স্মৃতিচিত্র 'চতুর্দশীর অন্ধকারের' মত জেগে থাকে- 'সবাই আমার মুখ দেখে না আমি সবার মুখ দেখি না / তবু তোমার মঠ ছেড়ে যাই না / চতুর্দশীর অন্ধকারে তোমার বুকে আগুন দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি / একা / এইখানে চুপ করে এইখানে ডোবা পেরিয়ে ঝুমকাফুলের মাঝখানে / ঠাকুরদার মঠ ।' আদিম লতাগুল্মময় (১৯৭২) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত এই কবিতাটির নাম 'ঠাকুরদার মঠ' । প্রতিদিনের চলমান বৃত্ত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও এই মঠের মধ্য দিয়েই প্রিয় মানুষগুলোর স্মৃতি আমৃত্যু বুকের ভেতর

বেঁচে থাকে । অনেকদিন পরে লেখা কবির 'বড় হওয়া খুব ভুল' (২০০২) ছড়ার বইটিতেও 'ঠাকুর দাদার মঠ' নামে একটি ছড়া আছে । সেখানেও আছে অন্ধকারের কথা । যে অন্ধকারে কবি জ্বালাতে চান একটি প্রদীপ । এই পৃথিবীতে বহু দিন, মাস, বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি বাইরে থেকে না ঘটলেও তার পূর্ণতা এসেছে মনের মাধুরী মিশিয়ে । ছড়াটির শেষে কবি-'বাইরে যতই কুজ্ঝটিকা / দুই চোখে হোক দিব্য শিখা,/ বুকের মধ্যে ঠাকুরদাদার মঠ' বলে একটা প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন । এ অঞ্চলের মঠসংস্কৃতি পূর্বপুরুষের উজ্জ্বল স্মৃতিবাহক । বিশেষ বিশেষ তিথি ও পূজা-পার্বনের সন্ধ্যায় জ্বালানো দীপমালার শিখায় পূর্বপুরুষের প্রতি আত্মনিবেদনের অনুভবটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বাঙালির ইতিহাস-নীহাররঞ্জন রায়, আদিপর্ব, কলকাতা, ১৩৮২.

২. ধর্ম ও সংস্কৃতি-নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৩. বাংলার লোকশ্রুতি-আশুতোষ ভট্টাচার্য, কলকাতা,১৩৯২

৩. সংস্কৃতির রূপান্তর-গোপাল হালদার, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৭৪

৪. টোটেম ও ট্যাবু-সিগমুন্ড ফ্রয়েড,১৯১৩

৫. রাঢ়ের পূর্বপুরুষ পূজা- ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা, ভোলানাথ প্রকাশনী, কলকাতা

৬. আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি-দিব্যজ্যোতি মজুমদার, লোকসংস্কৃতি ও অধিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা ২০০৪

৭. বাংলার লোকসংস্কৃতি-ওয়াকিল আহমেদ, ঢাকা, ১৩৮১

****

Ivory Creatives Studio

The Best Place for DTP, Design, Book Cover Design, Photo and Video Editing

contact

Email:- ivorystud@gmail.com

ভ্রমণ বৃত্ত

লালকেল্লা ও অন্যান্য

হঠাৎ দিল্লি-হিমাচল সফর

কানাইলাল জানা / পর্ব-১

গত সোমবার (২৫/৫/২৬) রাতে দমদম বিমান বন্দরে ফেসবুকে পারিবারিক স্টেটাস দেখে যাঁরা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অথবা জানাননি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। সফর বর্ণনা যাঁরা আশা করেছেন তাঁদের অন্যতম অজয় সান্যাল। সস্ত্রীক অজয় সান্যালের সঙ্গে পরিচয় ২০২৬ দিল্লি বইমেলায়। বিহারের পূর্ণিয়াবাসী এই সুশিক্ষিত ও সহৃদয় দম্পতির সেখানে বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ জেনে মুগ্ধ হয়েছি। তো এবারকার এই হঠাৎ স্বল্প সফর মেয়ে ময়ূরাক্ষীর সৌজন্যে। চারদিনের ছুটি জমা হতেই এই আয়োজন। হয়তো মায়ের কাছে হিমাচলের বিখ্যাত 'বীর'-এ'প্যারাগ্লাইডিং' করার অনুমতি পাবে এই আশায়। আগে সোলাং ভ্যালি, দার্জিলিং, উত্তরাখন্ড ইত্যাদি জায়গায় পায়নি। আমি তো কয়েক বছর চেষ্টা করে পাইনি 'মণিমহেশ' পরিক্রমা করার অনুমতি। কারণ: উচ্চতা এবং ট্রেকিং। যদিও উমাপ্রসাদ আবিষ্কৃত কৈলাশ দেখার আশা ছাড়িনি।

রাতের 'স্পাইসজেট' উড়ানে দিল্লি। ভোররাতে বিমান বন্দরের কাছেই ডিফেন্স এনক্লেভে 'হোটেল এ্যারোভিলা'-য় পৌঁছে ফ্রেস হয়ে আগে থেকে বুক করা গাড়িতে যাই 'লালকেল্লা' অঞ্চলে। আড়াই কিমি দীর্ঘ লালকেল্লা তৈরি শেষ হয়েছে ১৬৪৮ সালে। কিন্তু লাল বেলে পাথরের ঔজ্জ্বল্য এমনই যে মনে হবে এইমাত্র তৈরি হল। ভেতর দেখতে সময় লাগবে বিভিন্ন মানের টিকিটে এক একটি অঞ্চল। আপাতত অত সময় নেই। আগেই দিল্লিবাসী কবি প্রাণজি বসাক স্বাগতম জানিয়েছেন ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের শহরে। সত্যি তাপমাত্রা বাড়ছে চড়চড় করে। পাশেই জামা মসজিদ, চাঁদনিচক, গুরুদ্বার, মন্দির ইত্যাদি। এসব ছেড়ে গেলাম দিল্লি গেটের কাছে 'রামলীলা ময়দান'। প্রায়ই খবর হয়। দেখার ইচ্ছে অনেক দিনের। তো এই ময়দানের জন্ম কিন্তু ১৯৩০ সালে। আগে এখানে ছিল পুকুর। রামলীলাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হত যমুনা চরে। প্রায়ই ডুবে যেত চর। বয়সে নবীন হওয়া সত্ত্বেও এই ময়দান ঐতিহাসিক : এই রামলীলা ময়দানেই লতা মঙ্গেশকর প্রথম গেয়ে শোনান দেশাত্মবোধক গান- 'অ্যায় মেরে ওয়াতান কে লোগো'। এই ময়দানের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী প্রথম তাঁর স্লোগান তোলেন- 'জয় জোয়ান জয় কিষাণ'। ময়দানটি বেশ বড় হলেও অর্ধেকের বেশি ব্যবহৃত হয় গাড়ি পার্কিং-এ। এখন লোক ধরে ২৫/৩০ হাজার (ছবিতে নীল চট মজুত সর্বদা) অথচ ১৯৭৫

সালে ২৬ শে জুন জয়প্রকাশ নারায়ণের জনসভায় ভিড় হয়েছিল লক্ষাধিক মানুষের। ১৯৭৭ সালে জনতা দল গড়ার জন্য এই ময়দানেই একত্র হয়েছিলেন জগজীবন রাম, মোরারজি দেশাই,অটলবিহারী বাজপেয়ী, চরণ সিং, চন্দ্রশেখর। জগজীবন রাম বাদে সকলেই হতে পেরেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী! এখানেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছিল অন্না হাজারের বিক্ষোভ, বিদেশ থেকে কালো টাকা ফিরিয়ে আনার দাবিতে রামদেবের অনশন এবং দুবার ছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মুখ্যমন্ত্রীপদে শপথ অনুষ্ঠান।

এখান থেকে যাই 'দরিয়াগঞ্জ'। ফুটপাতে আগের মতো বাংলা বই না পেলেও সংগ্রহ করি সিলভিয়া প্লাথ,বানু মুশতাক এবং রেণুকা গাভরানীর বই The Art of Being Alone. দুপুরের খাবার নিতে মেয়ে বেছে নিল 'দ্য দরিয়াগঞ্জ' রেস্টুরেন্ট। অভিজাত এমনই যে কে আসেননি এখানে? জওহরলাল, ইন্দিরা গাঁধি, অটলবিহারী বাজপেয়ী, জেনারেল মানেকশ থেকে নার্গিস, রাজেশ খন্না, প্রাণ, উস্তাদ বিসমিল্লা খান....। দরিয়াগঞ্জ মালিকই তো 'বাটার চিকেন এবং 'ডাল মাখানি'র উদ্ভাবক। আমরা খাই বিরিয়ানি ইত্যাদির সঙ্গে তাঁদের বিশেষ পদ 'দরিয়াগঞ্জ তাজঘি'। বিল:২৮২৯ টাকা মাত্র!

পাশেই সংসদ মার্গে 'যন্তর মন্তর'। জয়পুরের পর এর স্থান। জয়পুরের মহারাজা সওয়াই জয় সিংহের সৃষ্টি। এই মান মন্দির সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি এবং সময় পরিমাপক যন্ত্র। প্রচন্ড খরায় জ্বলছে প্রিন্স ডায়ালটি। কেউ দুদন্ড দাঁড়িয়ে যে দেখবে সে পরিস্থিতি নেই। যন্তর মন্তর বা মান মন্দির আর আছে উজ্জয়িনী বারাণসী এবং মথুরায়। আগে দেখেছি উজ্জয়িনীটিরও কিন্তু ব্যাখ্যার তেমন কিছু খুঁজে পাইনি....

****

গল্পের কাছাকাছি

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

মেয়েটির পালস বিট দেখতে গিয়ে ডা. দিব্যেন্দু বসাক তাঁর অভিজ্ঞ আঙুলে দুটো স্পন্দন অনুভব করলেন। অজান্তেই চমকে উঠে মূর্ছিতার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন সেই নিষ্পাপ পবিত্র মুখে বেদনার আলপনা।

দিব্যেন্দুবাবুর মন খারাপ হয়ে যায়, কুমারী মেয়ে অনেক যন্ত্রণা অপমান সহ্য করতে হবে।

সুশ্রী মেয়েটির মুখে এক অদ্ভুত মায়া। প্রবীণের মনে অপত্যস্নেহের ঢেউ। বন্ধু দয়ালকে বলেন, একে কোথায় পেলি ?

-- এখন বাজার দিয়ে আসছি হঠাৎ দেখি মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছে। সবাই মিলে তুলে রিক্সায় তোর চেম্বারে নিয়ে এলাম।

-- কার মেয়ে, কোথায় বাড়ি জানিস ?

-- সে ঠিক জানা যাবে। ভাবিস না। তুই সুস্থ করে তোল দেখি।

জ্ঞান ফেরার পর আস্তে আস্তে ডা.বসাক সব জানলেন। তাঁর মুখে রামধনুর আনাগোনা।

মনে পড়লো কদিন ধরেই তাঁর ছেলে একটি মেয়েকে বিয়ে করার বিষয়ে মায়ের সঙ্গে জেদাজেদি করছে। বুদ্ধিমান ছেলে তাড়াহুড়োর কারণ মাকে জানায়নি। তবুও তিনি রাজি নন, ছেলেও অনড়। তিনি অবশ্য দর্শক ছিলেন, মাঠে নামেননি, আজ একেবারে রেফারির ভূমিকায় নামবেন।

ভুল হয়তো করেছে ছেলে কিন্তু দায়িত্ব অস্বীকার তো করেনি, এজন্য তিনি গর্ব অনুভব করেন। একটা গূঢ় রহস্য তার মনে পড়ে, স্বভাবত সৎ ডা. দিব্যেন্দু বসাকের জীবনে একটা ছোট্ট অন্যায় করেছিলেন, স্ত্রী রমার সন্তান ধারণে অক্ষমতার জন্য এমনই একটি মায়ের সন্তানকে একদিন রাত্রে মন্দিরের সিঁড়ি থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। অফিসিয়ালি দত্তক তাঁরা নেননি অথচ লজ্জা ঢাকতে নিজের সন্তান বলেই সযত্নে চালিয়েছিলেন। সেইসময়ই তাঁর নতুন হাসপাতালে রুটিন বদলি হওয়ায় ছেলের পরিচয় নিয়ে সমস্যা হয়নি। একটা উজ্জ্বল আলোর মতো বিষয়টা তার মন নাড়িয়ে দিল, অসুবিধা বুঝলে ছেলে বা মা যে-ই আপত্তি তুলবে তার উপরই তিনি মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ করবেন। এখন স্ত্রীকে তাঁর দজ্জাল ভিলেন মনে হয়।

অসম্ভব সম্ভব হলে হয়তো গল্পই মনে হয়, তাই সত্য হয়ে ওঠে, বিনু এখন ডা.বসাকের পুত্রবধূ।

এবং তিনি ও তাঁর স্ত্রী তৃতীয় প্রজন্মের অপেক্ষায় দিন গুনছেন।

কিচেন- স্টেশনে রেল- পিঁপড়ে

সনাতন দে।

কন্ডাক্টর চাইছিল, তাদের বাসটা উড়োজাহাজ হয়ে উড়ে গেলে বেশ হয়! গরিমা কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে মাথার উপর ঝুলন্ত হাতলটা ধরে ফেলল। ফাঁকা সিটের খোঁজে চোখ নিমেষ নিরীক্ষণ শেষে, যেখানে থেমে দাঁড়ালো -তা গরিমা স্বপ্নেও ভাবেনি।

রণজয়ের চিনতে দেরি হলো না। বলল, বসুন।

গরিমা নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল।

দুটি সুদর্শন যুবক যুবতী। বেশভূষা আধুনিক এবং মার্জিত। কারো মুখে কোন কথা নেই। রণজয় কথা বলারও কোন প্রয়োজন বোধ করল না। সেদিনের ঘটনার পরও সে সৌজন্যবোধ দেখিয়ে কথা বলেছে।

দুজনের গন্তব্যস্থলও একই। এমন কি দুজনে একই অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা। ওরা একে অপরের নাম জেনেছে নিজ নিজ ফ্যাটের দরজায় লাগানো নেমপ্লেট দেখে। পেশায় ইঞ্জিনীয়ার - দুজনেই আইটি সেক্টরে চাকরি করে।

কনডাক্টর ভাড়া চায়।হাত বাড়িয়ে রেখেছে। রণজয় মানিব্যাগে খুচরো খুঁজছে। গরিমার লক্ষ্য সেদিকেই। অপেক্ষা না করে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বাড়িয়ে বললো, বিশ্ববাংলা দুটো।

আরেকজন?

গরিমা ফ্যারাডের তড়িৎ সূত্রের বুড়ো আঙ্গুল হেলিয়ে রণজয়কে দেখালো।

রণজয় কিছু বলল না। কেবল ঘাড় ঘুরিয়ে গরিমার সুন্দর মুখখানা বেশ করে দেখল। রেশম কোমল চুলের গোছা রণজয়কে ছুঁয়ে গেল এক নিমেষ। গরিমা সাবধানী হল I

কেউ কোন ছলনায় কথা বলছে না। হয়তো বা ক্লান্তি।

দেখতে দেখতে বাস গন্তব্যস্থলে এসে গেলে, দুজনেই নেমে পড়ল। গরিমা দেখলো রণজয় অন্য দিকে যাবার জন্য উদ্যত। হাত নেড়ে বাই জানালো। রণজয় অনেক অনিচ্ছা নিয়ে হাত নাড়ালো।

বেশ গরম পড়েছে। গরিমা হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। আবাসনের কৃষ্ণচূড়া শেষ বিকেলে এখন পূর্ণমাত্রায় লালে লাল। গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।গতি মন্থর হয়।বেশ ভালো লাগছে আজ তার। রণজয় নাই কথা বলুক। তবু তার কথায় সে ভাবছে। সেদিন তার ঘরে গিয়ে অযথা কথা শুনিয়েছে। তবে সে ইচ্ছে করে বা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যায় নি। মনে হয়েছিল যে পিঁপড়ের সারি নিশ্চিত পাশের ফ্ল্যাট থেকেই আসছে। পিঁপড়ের প্রতি তার বিবমিষা। রণজয় কিছু মনে করে থাকলে তার করার কিছু নাই।

অফিসের কম্পিউটার স্ক্রিনে আটকে থাকা চোখ অসম্ভব আরামবোধ করছে।

সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত্রি হল। কলিংবেলের শব্দ। ডেলিভারী বয় কি এত তাড়াতাড়ি চলে এল! দরজা খুলতেই বিস্ময়ের আর সীমা রইল না গরিমার।

ভেতরে আসতে পারি?

সিওর আসুন। দরজা বন্ধ করে গরিমা বলল, বসুন।

ভাড়ার টাকা মেটাতে এসেছেন তো!

না না, ওটা এখন বাকি থাকবে।

তবে?

রান্নাঘরে চিনির কৌটোতে পিঁপড়ের সাড়ি। দেখতে এলাম, সেদিনের মতো রেল- পিঁপড়ে আপনার কিচেন- স্টেশনে এসে থেমেছে কিনা!

সেদিনের ঘটনার জন্য আমি সত্যিই অনুতপ্ত। এবার আমায় ক্ষমা করুন। আর কোনদিন নালিশ করব না।

রণজয় হাতখানি বাড়িয়ে দিল। গরিমা হাতখানি দুহাত দিয়ে চেপে রইল। আনন্দে দু চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ল হাতে। গরিমার জীবনে এই বুঝি প্রথম বসন্ত এলো।

রণজয় বলল, এবার চলি।

গরিমা মাথা নাড়ালো, নাহ্।

••

কিশোর গোয়েন্দা গল্প

‘সেভেন ও সেভেন গোয়েন্দা বাহিনী: শতবর্ষী প্রীতিলতা মেডেল চুরি রহস্য –

সুমি খান

রোলকল শেষ হতেই বেলা দিদিমণি ডেকে নিলেন কুশলকে।এই ১০টা প্রশ্ন বোর্ডে লিখে দাও। দিশা ভুলেই গেছে আজকে ক্লাস টেস্ট। নীতাকে বলে,“সর্বনাশ রে বন্ধু,মনেই ছিল না আজ পরীক্ষা। সেভেন ও সেভেন গোয়েন্দা দল রূপনারানের কুলে বেড়াতে যাব, কত কী গুছাচ্ছি শুধু। একটু বলে দিস রে।

চৈত্র-বৈশাখ মানেই বাংলা জুড়ে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি । দীনদয়াল মিশনারি স্কুলের শতবর্ষী ভবন, লাইব্রেরীর পেছনের বাগানের বড়ো আম গাছ আর কদম ফুলের গাছ বেয়ে অঝোরে বৃষ্টির জল। বিজলী চমকাতেই ঘন সবুজ পাতার আড়ালে ভিজে কাক,কোকিল থর থর করে কাঁপছে। কাঠবেড়ালির ছানা, বেজি সব গাছের কোটরে বা কোন গর্তে লুকিয়ে আছে।

ক্লাস নাইনের ফার্স্ট বয় কুশলের পিতামহ ফজলুর রহমান খান এই স্কুলের মূল প্রতিষ্ঠাতা এবং ভূমির মালিক দীনদয়াল ব্রহ্মার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সমাজহিতৈষী। কুশল আত্মসম্মান রাখতে সচেষ্ট। কুশলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিশেল তৃতীয় লিঙ্গ। বার্গেন্ডি চুলের কিশোরকে -বিজ্ঞান স্যারের দেয়া নাম ‘সেভেন ও সেভেন গোয়েন্দা বাহিনী’ প্রধান হিসেবে সমীহ করলেও;তাকে নিয়ে শিক্ষক,ছাত্র ছাত্রীদের ব্যাপক কৌতুহল।কুশলের কারণে তাকে ঘাঁটাবার সাহস পায় না কেউ।ক্লাসের থার্ড পজিশান ধরে রাখা নীতা টীমে সবচেয়ে শান্ত।নোটবুকে সব টুকে রাখে। গণিতবিদ সৌম্য,ক্যালকুলেটর লাগে না তার অংকের হিসেব করে দিতে। গেছো বাঁদর কাঁকন- সব সময়ে ব্যাকবেঞ্চার,পড়ালেখা মাথায় ঢোকে না দিশার মতোই। তবে,দারুণ ক্রিকেটার। বাহিনীর তিতিবিরক্ত সদস্য মিষ্টি,মনটা আকাশের মতো বিশাল।বন্ধুদের খাওয়াতে দু’পা আগ বাড়িয়ে রাখে।আছে বইপোকা অরুণোদয়।যার ফড়ফড়ানো সুলতানী আমল থেকে মুঘল আমলের পতনের ইতিহাস শুনলে কানে হাত দেয় দিশা আর মিষ্টি। কারো হাত পা কেটে গেলে অরুণোদয় ছুটে ব্যান্ডএইড নিয়ে।

স্কুলছুটির পর বৃষ্টিভেজা সোঁদা মাটির গন্ধ বুক ভরে নেয় মিশেল। কুশল,নীতা, মিষ্টি,সৌম্য, অরুণোদয় হাঁটতে থাকে মিশেলের পায়ে পায়ে। ছুটিতে রূপনারানের কূলে যাবার প্ল্যান আলোচনা করবে। হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে দিশা দাঁড়ায় এসে মিশেল আর কুশলের সামনে। বলে,লাইব্রেরিতে গত সপ্তাহের বইটি জমা দিতে গিয়েছিলো,তাতেই তার দেরি হয় আসতে।একটা মারাত্মক ঘটনা সে শুনে এলো, যা শুনলে চমকে যাবে সবাই। মিশেল আর

কুশল একসাথে তাকায়।

সাংঘাতিক কান্ড ঘটে গেছে রে! মিশেল, আমরা পারবো চোর ধরে মেডেল রহস্য উন্মোচন করতে? লাইব্রেরী রুম থেকে দীপ্তি দিদিমণি বড় দিদিমণির সাথে ইন্টারকমে কথা বলছিলেন।আমি গত সপ্তাহে নেয়া বই 'কেরী সাহেবের মুন্সী' জমা দিতে যাই। স্কুলের লাইব্রেরীের আলমারীতে রাখা মেডেলটার কথা মনে আছে?চুরি হয়ে গেছে রে!... চোখ কপালে ওঠে কুশল আর মিশেলের সাথে গোয়েন্দা বাহিনীর সব ক্ষুদে সদস্যদের।কী বলিস? বীরকন্যা প্রীতিলতার ছবি দেয়া প্রধানমন্ত্রীর সেই উপহার চুরি কে করলো?প্রায় শতবর্ষী ঐতিহ্য!

দিপ্তী দিদিমণিকে বড় দিদিমণি পুলিশ ডাকতে বললেন। মিশেল আর কুশল আলাদা হয়ে যায় গম্ভীর তাদের মুখ। বাকিরা ভাবতে থাকে, মিশেল কুশলের নির্দেশমতো তাদের কাজ করতে হবে।পুলিশের গাড়ির সাইরেনের শব্দে সবাই ছুটে যায় লাইব্রেরি রুমে। থানার বড়বাবু কথা বলছেন বড় দিদিমণি প্রণতি সেনের সাথে। রাশভারী বড় দিদিমণি, সহকারী হেড মিস্ট্রেস কল্যাণী দিদিমণি, রোকেয়া দিদিমণি, দিপ্তী দিদিমণি, প্রতিমা দিদিমণি, বিমান স্যার, কাজল স্যার -সকলে অস্থির, উদ্বিগ্ন হয়ে নবড় দিদিমণির রুমের দিকে চলে গেলেন।

গুমোট পরিবেশ,আলমারীর তালা আর খালি বাক্সের ছবি নিলো পুলিশ।মুল ফটক বন্ধ, দারোয়ান দাদা আছেন। রুমের জানালা বন্ধ। মিশেল কুশলকে বলে, স্কুলের ভেতর থেকেই কেউ নিয়েছে মেডেল।কুশল ও তাতে সায় দিলো।গোপন বৈঠকে বটতলায় ছুটে যায় সবাই। মরা গাছের শেকড়ের আসনে মিশেল বসে। নীতা তার নোটবই খুলে টুকতে থাকে। মিশেল বলে, দুই ভাগে ভাগ হয়ে অনুসন্ধানে নেমে যা, ক্লু যা পাবি জানাবি। আজ ই ধরতে হবে চোর। স্কুলের সম্মান রক্ষা করতে হবেই।অনুসন্ধানে নেমে লাইব্রেরিরুমে গভীর মনোযোগ দেয় ৭ গোয়েন্দার মিশেল সেভেন ও সেভেন টিম।হঠাৎ কুশল মিশেলকে দেখায় লাইব্রেরি রুমের মেঝেতে জুতোর হাল্কা ছাপ।কার জুতো?

লাইব্রেরিয়ান বিজন কাকা অবসরপ্রাপ্ত বাংলা শিক্ষক, তাঁর বড়ো সংসার চালানোর খরচ চালাতে বড় দিদিমণি তাঁকে গ্রন্থাগারিক পদে রেখেছেন। বিজন কাকা বলেন,"আজ দুপুরের খাবার খেয়ে ফিরে দেখি বাক্সে মেডেলটি নেই। কে নিল বুঝলাম না।... "

ক্ষুদে গোয়েন্দা দল গোল হয়ে যার যার ক্লু নিয়েআলোচনায় বসে।

লাইব্রেরির রেকর্ডবুক বের করে মিশেল। কুশল সহ পড়ে বলে,মেডেলের ভিতরে ১৯০০ সালে জমির মুল মালিক দীনদয়ালের লেখা ছোট্ট একটি চিরকুট ছিল,যাতে লেখা,"জমির মূল মালিক রঘুচন্দ্র দাস।"কুশল বলে, মেডেল নয়, সেই চিরকুট চুরি করেছে চোর।মিশেলের পেছন পেছন সিকিউরিটি রুমের গোপন কক্ষে ছুটে গেল ক্ষুদে গোয়েন্দা বাহিনী। । সিসিটিভির কোড বের করে ফেলে কুশল। তারা দেখতে পায়,মালী রামানুজের ছায়া মনে হলো লাইব্রেরীর ভেতরে। রামানুজের সামনে ছুটে যেতেই জোড় হাতে কুশলের সামনে দাঁড়ায় রামানুজ। তার কথা যেন

পুলিশকে বলা না হয়। বললো,বিজনকাকা আমাকে বলেন এই চিরকুটটি বের করে তাঁর লকারে রাখতে।এ জমি তাঁর পূর্বপুরুষের, চিরকুটটি তাঁর চাই। আমি গরীব মানুষ, মেয়েকে ওই মেডেলটা দিয়ে লকেট করে দেব বলে নিয়েছি কুশল দাদাবাবু। আমার দোষ নিও না।

সাথে সাথে সেভেন ও সেভেন বাহিনী ছুটে যায় বিজন কাকার টেবিলে। কুশল বলে-কাকা, তুমি বাগানে গিয়ে এই চিরকুট চুরি করতে বলেছ মালী রামানুজ? তোমার পূর্বপুরুষের জমি বলে কি স্কুলের জমি দখল করতে চেয়েছ?

বিজনকাকা ধরা পড়ে ভেঙে পড়লেন, বললেন,"হ্যাঁ, আমার দাদুর জমিটি স্কুলের জন্য কেন কেড়ে নিলেন দীনদয়াল বাবু?আমার উত্তরসুরিদের কাছে সেই জমি ফিরাতে চাই।”

সিসিটিভি ফুটেজে ক্ষুদে গোয়েন্দা দলের ছুটোছুটি দেখতে পেয়ে লাইব্রেরি রুমে সকলকে নিয়ে এসে বিজন কাকাকে ধরে নিলেন বড়বাবু। সেভেন ও সেভেন ক্ষুদে গোয়েন্দাবাহিনীকে সম্মান করে স্যালুট দিয়ে হ্যান্ডশেক করলেন বড়বাবু। বললেন, আমাদের বড় সহযোগিতা করলে ক্ষুদে গোয়েন্দারা। অভিবাদন তোমাদের।

বড় দিদিমণি প্রণতি সেন যেন ভারমুক্ত হলেন মিশেল কুশলকে বললেন,আমাদের সম্মান রক্ষা করলে তোমরা। তবে,পরীক্ষাতে খারাপ করা চলবে না।

সেভেন ও সেভেন বাহিনী বড় দিদিমণির পা ছুঁয়ে শপথ করে, স্কুলের সম্মানহানি কখনো হতে দেবে না।

আকাশে রামধনুর রাঙা আলোয় নতুন আভা ৭ ক্ষুদে গোয়েন্দার মুখে। সেভেন ও সেভেন অজেয়।

****

গল্প

“একদিন যারা মেরেছিল তারে গিয়ে”

অর্জুন শর্মা

গ্রামে ঢুকতে বা গ্রাম থেকে বের হতে গেলে জোড়া নিমের তলা দিয়েই যেতে হয় । পথের প্রায় সমকৌণিক বাঁকের পাশেই জোড়া নিমগাছ । বুঝা যায় দুটো গাছ জড়াজড়ি করে আছে । পাশেই আছে দুটো কাঁঠাল গাছ ও একটা চাঁপা গাছ । ‘সুর্য ডোবার পালা’ শুরু হলে অনেকে এই নিম-কাঁঠাল-চাঁপা’র তলায় বসে আড্ডা দেয় মাঝে মাঝে । তবে সন্ধ্যে হলেই জায়গাটা নিঃঝুম হয়ে যায় । আঁধার রাতে মনে হয় তিন চারটা অশরীরী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে । গাঁজাখোর বিল্লু তো অনেক দিন নিমগাছের ডগায় সাদা শাড়ি পরে একজনকে নাচতেও দেখেছে । অনেকে একে গাঁজার কারসাজি বললেও কেউ কেউ বলে , “হলেও হতে পারে !” তবে এটা সত্য যে রাতে ওই জায়গায় একা যেতে অনেকে ভয় পায় ।

গত কয়েকদিনের ঘটনাপ্রবাহে জোড়া নিমের তলা শুধু সরগরমই হয়নি ,খবরের কাগজের শিরোনামেও চলে এসেছে । সাপ্লাই লাইনে সাতদিন জল বন্ধ থাকলেও যেসব নেতার হেলদোল ছিল না, দেখব দেখছি করে এড়িয়ে যেত , সেই নেতাদের পদভারে জোড়ানিমের আশপাশের ভূমির ঘাস লোপাট হয়ে গেছে এই ক’দিনে । সালিশী বসেছিল কাঁঠাল-চাঁপার তলায় ,সুরাহা হয় নি । একটাই সমবেত নিদান , “যোগমায়া খারাপ , এটাই তার উপযুক্ত শাস্তি ”। গ্রামের মাতব্বর গগন ,তার ছত্রধারী সাগরেদ হেমু আর মহিলা নেত্রী জবা ও সীমা সমস্বরে বলল, “পুলিশ টুলিশ এ গ্রামে ঢুকতে দেব না ,আমরাই শেষ কথা” । আশপাশের গ্রামের সবাই জবাদি আর সীমাদিকে সেলাম ঠুকে এবং সেলামের ঠেলায় জবাদি সীমাদিরা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ নয় , একেবারে বটগাছ হয়ে গেছে । আশপাশের গ্রামের কতগুলো সংগঠনের মাথা এই দুই মহিলা , একটু কড়া ধাতের না হলে কি চলে ? কোন বাড়িতে কাজের মহিলাকে বকেছে , দ্রুত নালিশ জমা হয়ে যায় জবাদিদের দপ্তরে , কোথাও স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া, জবাদিরা মধ্যস্ততায় হাজির । ধান কাটার কাজে পাশের গ্রামের দুই মহিলা শ্রমিকের হাজিরার টাকা নিয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে জবাদিদের দরবারে নালিশ জানালে জবা-সীমার টিম তেড়ে গিয়ে ধানের মালিক পরিমলকে আঙ্গুল তুলে শাসিয়ে এসেছে। পরিমল রেগে গেলে তাকে মহিলা কেইসে ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয়ও দেখিয়েছে । ভয়ে পরিমলকে জবা-সীমার সঙ্গে চাঁদা দিয়ে রফা করতে হয়েছে । কারণ গেল বছর এলাকায় সজ্জন বলে পরিচিত বিমানবাবুকে সামান্য কারণে জবা-সীমার টিম যেভাবে বেইজ্জত করে ছেড়েছে তার ছবি এখনও তাজা । টিঙ্কু তার কাজের মেয়েকে বকাবকি করে

ছাড়িয়ে দিয়েছিল । জবা-সীমা দস্তুরমতো শ্রমিক আইনের ভয় দেখিয়ে টিংকুকে শায়েস্তা করেছে ।

গগন-হেমু এণ্ড কোং কোনো মহিলা সংক্রান্ত কেইস হাতে নেয় না । তবে দরকার পড়লে বাইরে থেকে সাহায্য করে ,বুদ্ধি পরামর্শ দেয় । তাদের কাজের পরিধি, বিস্তার অন্যরকম । উপর থেকে যেমন যেমন নির্দেশ আসে তেমন তেমন করে । গ্রামে কে কে সরকারি ঘর পাবে ,কার বাড়ির সামনে হাতকল বসবে , কোন পাড়া ঘেঁষে আগে ইলেক্ট্রিকের লাইন যাবে , কে কে ভাতা পাবে, কে মাছের পোনা পাবে , কে পুকুর পাবে , কে নূতন রেশনের ডিলারশিপ পাবে সব তালিকাই তৈরি করতে হয় গগনদের । এ বড়ো কঠিন কাজ । গগন বলে , “সবাইকে তো আর খুশি করা যাবে না !” আড়ালে কেউ কেউ পক্ষপাতিত্বের ত্রুটি ধরলেও মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস দেখায় না । নিজেদের লোক হলে একটু এদিক সেদিক করে নিতে হয় । নতুবা সামনে আর এই পদ পাওয়ার আশা থাকবে না । তাই নিতাই এর টিলা জায়গায় জল থাকার সম্ভাবনা না থাকলেও পুকুর কাটার নামের তালিকায় নিতাই এর নাম সবার আগে রাখতে হয়েছে । ঠোঁট-কাটা বিভাস বলেই ফেলেছে , “গগনদা ,এটা ঠিক হল না । নিতাইদার কীসের অভাব । সুবলের জমিটাও নিচু আর তার একটা পুকুর হলে মাছের চাষ করেও কিছু আয় করতে পারত, সংসারের টানাটানি কিছু কমত ।” গগনের আগেই হেমু বিভাসকে ধমক দিয়ে বলেছে , “যেসব বুঝিস না ,তাতে নাক গলাবি না । তুই জানিস নিতাই এর বাড়িতে মোট কত ভোট ?” বিভাস গজ গজ করতে করতে উঠে চলে যায় । হেমুকে আড়ালে সবাই ছোটো মাতব্বর বলে ডাকে ।

নিন্দুকেরা নানা কথা বলে । এসব অবশ্য গগন-হেমু গায়ে মাখে না । ফিসফাস শোনা যায় ,ঘর দিলে ,পুকুর পেলে, বিভিন্ন রেইটে কমিশন একটা দিতে হয় গগন-হেমু এণ্ড কোং কে । এমনও হয় , দু’বস্তা সিমেন্ট ,দুটো প্লাস্টিকের চেয়ার , নিদেন পক্ষে মিটিং এর টিফিনের খরচ হলেও দিতে হয় । সব যে গগন-হেমু পায় তা নয় , আরও উপরেও দিতে হয় । যারা প্রাপক তারা ব্যাপারটা অতি সহজভাবে নেয় , কারণ অন্যথা করার বা প্রতিবাদ করার মতো বোকামি আর নেই !

হেমু সম্পর্কে আর একটা কানাঘুঁষা শোনা যায়, হেমুর মহিলাদের প্রতি দুর্বলতা আছে । একথাও অবশ্য কেউ প্রকাশ্যে বলে না । অলস দুপুরে আহারান্তে অথবা অপরাহ্নে পাড়া বেড়ানোর ফাঁকে তিন চারজন মহিলা একত্রিত হলে ফিসফাস করে বলাবলি করে , “জানো তো , হেমুকে নাকি রাতের দিকে যোগমায়ার বাড়ির দিকে যেতে দেখেছে অনেকে ।” একজন টিপ্পনি কাটে , “কী

ঘেন্নার কথা , হেমুর ঘরে সোমত্ত বউ আছে ”। আরেকজন বলে , “স্বামীটা নিরুদ্দেশ হয়ে যোগমায়াকে কুপথে ঠেলে দিয়েছে ”। আগেরজন বলে, “তোর যেমন কথা , স্বামী থাকা না থাকা ব্যাপার নয় , মাগীর এমনিতেই খাই খাই স্বভাব ।” একজন বলে, “যোগমায়া কিন্তু আগে এমন ছিল না । মানুষের সময় কখন কীভাবে যাবে কেউ বলতে পারে না ।” প্রথম জনের রসালো উত্তর, “যোগমায়ার শরীর কিন্তু আকর্ষনীয় । মধু থাকলে মৌমাছি তো ভিড়বেই ,বল । আমার মরদ বলেছে গ্রামের কিছু জোয়ান পোলাপান নাকি যোগমায়ার ঘরে ঘুর ঘুর করে ।” আগের জন যোগ করে, “তোর মরদ এত কিছু জানল কী করে ? সন্দেহ হচ্ছে । সাবধানে রাখিস কিন্তু ।”

চায়ের দোকানের আড্ডায় দিল্লী,আমেরিকা, চীন,রাশিয়া বিষয়ক আলোচনা শেষ করে একসময় যোগমায়া পর্ব উঠবেই । রসালো আলাপে আসর জমে উঠে। বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে আসতে দেখলেই আলোচনা মাঝপথেই থেমে যায় ।

যোগমায়ার বয়স ত্রিশের কোঠায় । ফর্সা না হলেও কালো নয় । তার নির্মেদ শরীর ,আকর্ষনীয় মুখের গঠন ,আর সদা হাস্য মুখ সকলের কাছে তীব্র আকর্ষণের কারণ । মা আর এক ভাই আছে দূরের এক গ্রামে । স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে অনেক বছর হল । যোগমায়া এখন শহরে গিয়ে বাবুদের বাসায় কাজ করে । পাড়ার দিদি বৌদিদের সকলের ঘরে তার অবাধ বিচরণ । অবসরে হয়তো সোমা বউদির ডাঁটা কেটে দিল , তপার মা’র ইঁচড় রেঁধে দিল , দিপুর চুল বেঁধে দিল – এসব করে সে পাড়া বেড়ায় । নীতু বউদির ছেলের জন্মদিনে লুচি ভেজে, পায়েস রেঁধে সবাইকে পরিবেশনও করল । এভাবেই তার দিন যায় । যোগমায়া হা হা করে হাসে । জবার মা বলে , “মরদের সামনে এমন বেহায়ার মতো হা হা করে হাসি ভালো না । লক্ষণ খুব খারাপ । যোগমায়ার ওই হাসিতে জাদু আছে । জোয়ান পোলাপান সেই জাদুতে ধরাশায়ী !”

যোগমায়া জানে, যারা তাকে খাটিয়ে নেয় তারাও তাকে অপবাদ দেয় । সামনে হাসে , পেছনে বিষাক্ত ফলায় বিষ উগরে দেয় । তার একমাত্র প্রাণের বন্ধু হল পাগলা শিবুর বউ মায়া । আধ পাগলা শিবুও মাঝে মাঝে কোথায় যেন চলে যায় । হঠাৎ একদিন এসে হাজিরও হয় । মায়া বুঝে যোগমায়ার কষ্ট । সেবার জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিল যোগমায়া । একমাত্র মায়া এসেই দুইদিন তিনরাত সেবা করেছে । জলপট্টি দিয়েছে , বার্লি রেঁধে খাইয়েছে । এখন এই দুর্দিনেও মায়াই লুকিয়ে যোগমায়ার প্রাণ বাঁচিয়ে রেখেছে । সেদিন সালিশী সভায় দুজন শুধু প্রতিবাদ করেছিল , এক , ঠোঁটকাটা বিভাস আর দুই, মায়া । তাদের কথা যদিও ধোপে টেকে নি । বিভাস গজগজ করে চলে গেছে । পাগলা শিবু বউকে টানতে টানতে নিয়ে গেছে ।

গত পরশু ভোরবেলা ঘটনার সূত্রপাত । হরিধনের বউ শিখা নাকি পালবাড়ির ছেলে গোপালকে যোগমায়ার বাড়ি থেকে বের হতে দেখেছে । ব্যাস, শিখা দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ করে খবর পৌঁছে দিল জবাদি-সীমাদির ব্রাঞ্চে । ফাঁকে আরও পাঁচজনকে জড়ো করল । যথাসময়ে জবাদি সীমাদি প্রমিলা বাহিনি নিয়ে অকুস্থলে হাজির । কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই যোগমায়ার উঠোন দখল নিয়ে নিল একঝাঁক কোমরে কাপড় বাঁধা মহিলা । মুখে তাদের অশ্রাব্য ভাষা । খুব খারাপ একটা শব্দ যোগ করে একজন বলল, "এখনই চুলের মুঠি ধরে টেনে আন ।" একজনের কথা, "জোয়ান জোয়ান পোলাপানের মাথা খাচ্ছে ড্যামনিটা।" আর একজন বলল, "দরজা ভেঙ্গে দেখ এখনও নাগর নিয়ে পড়ে আছে ।" অনেকের জোরালো দাবি, "তাকে মাথা মুড়িয়ে গ্রাম ছাড়া কর ।"

উঠোনের কলরবে ঢুলু ঢুলু চোখে দরজা খোলে যোগমায়া । সে যেন উত্তপ্ত কড়াইতে ফুটন্ত তেলের মধ্যে পড়েছে । সমাগমের কারও তর সইছে না । অতি উৎসাহী কয়েকজন দাওয়ায় উঠেই চুলের মুঠি ধরে যোগমায়াকে উঠোনে নামিয়ে আনে । ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল হয়ে যায় যোগমায়া । মহিলা বাহিনি কতটা উগ্র হতে পারে সেদিনের ঘটনা তার সাক্ষী । যে যেমন পারে হাতের সুখ করে নিয়েছে । দুয়েকজন পায়ের জুতো খুলেও মারল । সবার কথার সারমর্ম হল যোগমায়াকে গ্রাম ছাড়া করতে হবে । এতক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষনরত জবাদি সীমাদি এবার হস্তক্ষেপ করল । ততক্ষণে যোগমায়া সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত । পাগলা শিবুর বউ মায়া ছুটে এসে যোগমায়াকে আগলে ধরে বলল, "আপনারা কী করছেন এসব? দেশে কী বিচার আচার বলে কিছু নেই ? মহিলা হয়ে আপনরা একটা নিরীহ মহিলাকে এভাবে মারলেন ? এটা অন্যায় ।" জবাদি এবার ধমক দিয়ে বলে, "নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও মায়া । বেশি দরদ দেখাতে এসো না।"

খবর গেল গগন-হেমুর কাছেও । তারা আসবার আগে আর একবার জুতোপেটা করা হল যোগমায়াকে ।

বিচারসভা বসল । আলোচনা হল সামান্যই । প্রমিলা বাহিনি প্রদত্ত নিদানই বহাল রইল । মাথা মুড়িয়ে যোগমায়াকে জোড়া নিম গাছে সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে তিনদিন । তারপর তাকে গ্রাম ছাড়া করতে হবে ।

শেষে তাই করা হল । জোড়ানিমের সঙ্গে হাত-পা-বাঁধা , মাথা মুড়োনো যোগমায়া যেন একবিংশ

শতকের মাহাকাশ অভিযানকে উপহাস করছে । ছেঁড়া ব্লাউজের ফাঁকে দৃশ্যমান নারী শরীর ব্যঙ্গ করছে গুহাবাসীর উত্তরসূরীদের ।

মাঝরাতে যখন গ্রাম নিশুতি হয়ে যায় তখন চুপি চুপি পাগলা শিবুর বউ মায়া শিবুকে সঙ্গে করে এসে যোগমায়াকে ভাত জল খাইয়ে যায় । যোগমায়াকে আদর করে যায় । শিকলের বেড়ির তালা খুলতে পারে না । চোখের জল ফেলে যায় ।

আজ তৃতীয় দিন । সন্ধারাত পেরিয়েছে অনেকক্ষণ । চাঁদের আলোয় জোড়া নিমের গাছে বাঁধা যোগমায়াকে অশরীরী বলে মনে হয় । সারাদিনের উপবাসে , মানসিক ধকলে তার মাথা নুইয়ে আছে । কার যেন পদক্ষেপ ধীরে ধীরে খুব কাছে এল । যোগমায়া চোখ খুলল । চুপি চুপি গুটি গুটি পায়ে হেমু এসেছে । চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নীচু স্বরে বলল , "যোগা , তুই ভুল বুঝিস না । আমি সালিশীর কিছু জানি না ।" কথার ফাঁকে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে,পাছে কেউ দেখে ফেলে ! ইনিয়ে বিনিয়ে আরও সাফাই গাইল । যোগমায়া কিছু বলছে না দেখে হেমু বাড়ির পথ ধরল । একটু বাদে যোগমায়া তার দুর্বল কণ্ঠে ডাকল, "ছোটো মাতব্বর ,কাছে এসো ।" হেমু চারিদিকে পরীক্ষা করে আগ্রহ নিয়ে দ্রুত যোগমায়ার দিকে এগিয়ে যায় । এখন একহাত দুরত্ব দুজনের মাঝে । হেমুর সাগ্রহ প্রশ্ন , "কিছু বলবি যোগা? কিছু কি খাবি ? তাহলে আমি গিয়ে নিয়ে আসি ।" যোগমায়া নিঃশব্দে মাথা সোজা করল । ভাল করে খেয়াল করলে দেখা যেত তার চোখে তখন চামুণ্ডার চাহনি । সর্বশক্তি জড়ো করে যোগমায়া যা করল তার জন্য হেমু প্রস্তুত ছিল না একেবারেই । একহাত দূরের হেমুর গালে যোগমায়া তার মুখে জমানো থু থু ছিটিয়ে দিল ।

একবিংশ শতকের জল স্থল অন্তরীক্ষ বিজয়ী গর্বিত বসুন্ধরার প্রতিনিধি হেমু এক অবলা অসহায় কামিনীর থু থু গালে বয়ে পড়ি কি মরি করে পালিয়ে বাঁচে । চাঁদ আর তারার ক্ষীণ আলোর পাহারায় বিধ্বস্ত সভ্যতা জোড়া নিমের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে,দাঁড়িয়েই থাকে ।

* * * * *

গল্প হয়ে যায়

নন্দিতা সাহা

আমাদের বাড়ির উঠোনে বর্ষা কালে মাঝে মধ্যে সাপ আর ব্যাঙকে মুখোমুখি দেখা যেত। আর মা চিৎকার জুড়ে দিত, ওরে লক্ষ্য রাখ ব্যাঙটা কোন দিকে যায়। ব্যাঙ যেদিকে যাবে সাপ ও তার পেছন পেছন ছুটবে।

বাড়ি শুদ্ধ লোকের ভয় ,যদি ব্যাঙ আমাদের ঘরের দিকে আসে! তবে ত! বাপরি! সাপটাও ঢুকে পড়বে।

সেই ভয়ে মা আমাকে বসিয়ে রাখত গ্রীলে ঘেরা বারান্দায় , একটি নড়বড়ে উচু চারপেয়ে টেবিলের উপর। আমি বসে নজর রাখতাম।

সেবার মুখোমুখি হল গুখরো আর কোলা ব্যাঙ। কেউ কারো কম নয়। দুটিতেই সমান পালোয়ান। ভয়ে মা, ভাই থরহরি কম্প। আমি ঠিক আমার জায়গায়, মানে টেবিলের ওপর বসে নজর রাখলাম। ওতেই adventure এর আনন্দ পেতাম।

ঠায় বসে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি উঠোনে কিছু নেই। কিন্তু কোথায় গেল। যাক-গে, হয়ত সামনের ঝোপে ঢুকে পড়েছে।

টেবিল থেকে লাফিয়ে যেই না নামব, ওরে বাবা!!!!! সব্বনাশ। আমার টেবিলের তলায় গুখরো । মুখে কোলা ব্যাঙ এর আধ খানা ! ঠ্যাং দুটো পির পির করে লাফাচ্ছে।

আমি চিৎকার করে মাথার ওর একটা কাঠের তক্তা ধরে ঝুলে পড়লাম। মানে আমি শূন্যে ঝুলছি। মুখ দিয়ে কেবল গো গো শব্দ। নীচে সাপ, আমি শূন্যে। কেবল কাঠের তক্তাই ভরসা। ওটাই আমার জীবন দায়ী। ওটা ভেঙে গেলে একেবারে গুখরোর ঘাড়ে গিয়ে পড়ব। সাপটাও বুঝি ঘাবড়ে গেছে। ঠাওর করতে পারছে না কোনটি বেশি লোভনীয়। ওই কোলা ব্যাঙ, নাকি তরতাজা মানুষ। আমার লিকপিকে শরীর টা ------ ! কোনটিতে উদরপূর্তির আনন্দ বেশি হবে! আমি গো গো করছি। গুখরো আড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ মা জোর ধাক্কা দিল। কিরে! অমন করছিস কেন!

আমি হকচকিয়ে বললাম, সাপটা! টেবিলের নীচে-----!

---------- শিবু ওঝা এসে নিয়ে চলে গেছে। আর আসবে না। নে ওঠ ,ওঠ,। টেবিলের ওপরই ঘুমিয়ে পড়েছিস।

আমি মাকে জড়িয়ে ধরলাম। ওহ, তার মানে স্বপ্ন দেখেছি! কি ভয় পেয়েছিলাম ।

ভাই ফচকে হেসে ,তুই একটা ভীতু র ডিম, বলেই পাই পাই করে ছুট লাগাল।সত্যি শৈশবটা ছিল রঙিন। কত রঙের ঘটনা আমাদের কচি সাদা মনে কেমন দাগ কেটে রেখেছে। আজও স্মৃতির পটে এই ছোট ছোট ঘটনাগুলি উজ্জ্বল। সত্যি ঘটনাগুলো কেমন গল্প হয়ে যায়।

****

জলের দাগ

উত্তম ভট্টাচার্য

মাথা গরম করো না- একটু ঘুমোও। ঘুমানোর চেষ্টা করো....
পাশে শুয়ে গিন্নির চাপা গলায় করুণ আর্তনাদ।- ..
শুনতে পাবে যে....

জহরবাবুর তবুও বাধ মানে না- শুনতে পাবে যে! দেখেছো না? ছোটোলোকগুলোর ব্যাপার স্যাপারগুলো দেখছো না?
ঘুমোতে দিচ্ছে?
এখন রাত ক'টা বাজে? এখন ওসব করার সময়? বলি, দেশে পুলিশ বলেও তো কিছু থাকার কথা? তারা আদৌও কি আছে?

চুপ করো না! বুঝতে পারছো না কেন? ওরা শুনতে পাচ্ছে যে!

শুনতে পায় তো পাক না। শোনার জন্যই তো বলছি!

"শোনার জন্যই তো বলছি"! মস্ত বাহাদুর! বলি, শুনে ওরা এগিয়ে এলে সামাল দিতে পারবে তো তখন? কে আছে তোমার পাশে?

হার্টের মরণ ব্যামো, বাতের ব্যথা আর কানা দুটো চোখ নিয়েই তো দুজন আধমরা বুড়ো-বুড়ির বাস।

কী দরকার বাপু- মিছিমিছি শত্রু বাড়াবার? চারদিকে যা দিনকাল পড়েছে? আক্রোশের বসে হয়তো তেড়েফুড়ে এসে একদিন এমন কচলে দিয়ে যাবে যে পুলিশ কেন স্বয়ং ভগবানেরও আর কিছু করার থাকবে না। কেউ খুঁজেও পাবে না! এই বয়েসে ওদের বিরুদ্ধে তুমি কোন সাহসে লড়বে? কে দাঁড়াবে তোমার পাশে ?

জহরবাবু এসবের সবটাই বোঝেন। তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর লোকজন যে ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে তা জহরবাবু ছাড়া এই মুহূর্তে আর তেমন কেই বা ভালো বোঝেন? আশির

কাছাকাছি বয়স হলো তাঁর। কাদা মাটি মাড়িয়ে ঘরের চৌকাঠে এসে ভালোজলে পা ধুয়ে তবেই ঘরে ঢুকতে হতো একসময়। সেই সরু কাঁচা রাস্তা, সেই এঁদো ডোবা, সেই খাল সেই দীঘল পুকুর আজ আর কোথায়? দু একটা চোখে পড়লেও একটু বৃষ্টির জলেই তা পাড়া ভাসিয়ে সবাইকে নাকাল করে দিয়ে যায়।

হনুমানের মতো রাত দুপুরে যারা উল্লাস আর ফুর্তি করছে, দানবীয় যন্ত্রের বিকট গর্জনের তালে তালে সেকেন্ডে দশটা বাজি ফাটাচ্ছে- এদের মা বাবারা এককালে পেটভরে দুবেলা খেতে টুকুও পেত না।

ওই প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর ছেলেটার কথাই ধরো না। না খেতে পেয়ে যক্ষা হয়ে ঘরেই মরে পড়েছিল মানুষটা। তার ছেলে দুটোর দিকে তাকাও। জমিদারের বাচ্চা বললেও যেন কম বলা হয়।

এদের কাছে শিষ্টাচার, মূল্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধে কী-ই বা মূল্য আছে?

মানুষের জীবনের মূল্য সম্পর্কে এদের কতটুকু জ্ঞান আক্কেল আছে? কার দায় কে নেবে?

তাই তো বে-আক্কেলের দল রাত দুপুরে উন্মাদের মতো 'নেত্ত' করছে।

কথাকটা বলতে বলতেই কখন যেন কেমন করে চোখে জল এসে যায় জহরবাবুর। গলা ভারি হয়ে আসে তাঁর।

কী জানি বাপু এদের অর্ধেককেই তো ঠিক চিনি জানি না.......! গিন্নির গলাতেও সেই উৎকণ্ঠার আভাস!

চিনবে আর কী করে? ইদানিং নব্বই শতাংশই বাইরে থেকে এসে জুটেছে। সুতরাং, সোনায় সোহাগা! কেউ কাউকেই চেনে না, জানে না। কেউ কাউকেই বোঝাবার চেষ্টাটুকুও করে না।

দেখতে দেখতেই কেমন যেন পাল্টে গেল সমাজটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এলো মেয়েমানুষটার বুকের পাঁজর ভেদ করে।

স্বামীর মাথার পাশে বসে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে করুণ সুরে আক্ষেপ করতে থাকেন তিনিও- এই তো সেদিনের কথা-তোমার হাত ধরে যেদিন প্রথম এ বাড়িতে এসে ওঠা, সেদিন কেবল এই বাড়িটাকেই নয়, পাড়াটাকেও সত্যিই স্বর্গ বলে মনে হতো আমার। এতোকাল ধরে এপাড়ায় বাস করে সত্যিই বলছি একদিনের জন্যও এতোটুকুও ভয় আসেনি মনে। বরং আমার বাড়তে থাকা মাথার চুলের মতোই কত যত্ন,কত ভালোবাসা, কত সম্মান, কত সুখ অনুভব

করেছি গো মনে। আত্মীক সম্পর্ক, নাড়ির টান গড়ে উঠেছিল আমার সমস্ত জীবনে-যাপনে। কিন্তু, আজ ভয় করছে গো! সত্যিই ভয় করছে আজ নিজের ঘরেই। আরও ভয় করছে- তুমি আমার পাশে না থাকলে.... আমি আর ভাবতেও পারছি না যে...!

আজ আমরা সবাই কেমন অসহায়....! ওদের রুচি, মূল্যবোধের সাথে নিজেদের মেলাতে পারি না- এটাই আমাদের একমাত্র অপরাধ! আমরা নিরুপায়! তাই, দোহায় তোমার- এই বয়েসে কেবল মুখ বুঁজে সহ্য করে যাওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কী উপায় আছে বলো? তুমি কোনও কথা বলো না প্লিজ......! চুপচাপ থাকারই চেষ্টা করো লক্ষ্মীটি....!

তাই বলে মাঝরাতেও প্রকাশ্যে রাস্তায় এমন দানবের মতন বেলাল্লাপনা করবে? মানুষকে ঘুমতে দেবে না। রোগীদের কথাও চিন্তা করবে না? এ-সবই মেনে নিতে হবে...?

একটু আবেগের বসেই শ্লেষের সুরে কথাকটা বেড়িয়ে আসে জহরবাবুর দগ্ধ কলিজার পর্দা ভেদ করে। হয়তো একটু তীব্রতার ঝাঁঝও ছিল তাঁর দগ্ধ কলিজার ভাঁজে ভাঁজে।
আর তাতেই হলো যত কাল।
কথা বলতে না বলতেই হঠাৎ কান ফাটানো একটা বিকট আওয়াজ সবটুকু সহ্যের সীমা অতিক্রম করে একেবারে আছড়ে পড়ল জহরবাবুর ঠিক সদর দরজাটার মুখে।
মেঝে থেকে দেওয়াল, দেওয়াল থেকে নড়বড়ে খাটটা পর্যন্ত কেঁপে উঠলো প্রায়। মনে হলো, এ কোনও খেলনা নয়, যেন একটা সত্যিকারের বজ্রশেল এসে হুড়মুড়িয়ে আছড়ে পড়ল তার মাথার কাছে। তাতেই আচানক চমকে উঠলেন জহরবাবু। একবার মাত্র চিৎকার করে ডুকড়ে উঠলেন তিনি....'শান্তা! আঃ..আঃ...!'

স্ত্রীও আর্তনাদ করে জড়িয়ে ধরলেন স্বামীকে... 'কী হলো...এই তো এই তো আমি এখানে..!.'

সে কথা শোনার আগেই বারদুয়েক মাত্র হাত পা দুটি দাপাদাপি করলো জহরবাবু। তারপর কিছু বুঝে উঠবার আগেই নিজে থেকেই হঠাৎই কেমন যেন শান্ত হয়ে গেলেন অশান্ত মানুষটা।

কেবল মনে হলো- চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে তখনও বুঝি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষ্পলক নয়নে শান্তির পথ চেয়ে
তাকিয়ে রয়েছেন তিনি এই দানব-যান্ত্রিক সমাজটার মুখের পানে চেয়ে।

****

এক যাদুকরী আয়না, নীলাঞ্জনা, ভালোবাসা

সুনির্মল বসু

অন্ধের মতো ভালবেসে আমি একটা কাঁচের বাড়ি মনে মনে তৈরি করেছিলাম।

সেই স্বপ্নের বাড়িতে মাথার উপর ছিল নীল আকাশের সামিয়ানা, নীল সমুদ্রের পাড়ে আমার সেই কাঁচের বাড়ি। সামনে নীল ঢেউওয়ালা গভীর সমুদ্র। সাগরের তটরেখায় আমার আকাশ ছোঁয়া প্রাসাদ।

আমার গানের ভুবন সেখানে। আমি গান লিখি, গানে সুর দিই, তারপর সেই গানকে জনসমক্ষে তুলে ধরি। আমার কাঁচের বাড়ির মধ্যে একটা যাদু আয়না রেখেছি। এই আয়নাটা বড় অদ্ভুত। নিচে পথ চলা মানুষদের চলাফেরার ছবি এই আয়নায় প্রতিফলিত হয় না। কোন কোন বিশেষ মানুষ কোন কোন দিন আমার আয়নায় ধরা পড়ে।

তোমার পবিত্র মুখের ছবি এক সকালে আমার ম্যাজিক আয়নায় ভেসে উঠলো। অনেক উঁচুতে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তোমাকে আমি হাতছানি দিয়ে ডাকলাম। তুমি উপরে উঠে এলে। সমুদ্র দেখলে। বাতাসে তোমার চুলগুলো উড়ছিল। ডান হাতে তুমি কপালের উপর ছড়িয়ে পড়া কেশ চূর্ণগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছিলে। আর, আমি তোমার দিকে চেয়ে গভীর মুগ্ধতায় মরে যাচ্ছিলাম। বেশ মনে আছে, সেদিন তুমি নীল শাড়ি পরেছিলে, তুমি কি জানতে আগে থেকে, নীল রং চিরকাল আমার বড় পছন্দের।

প্রশ্ন করলাম, কী নাম? কোথায় বাড়ি?

তুমি হেসে বললে, একসঙ্গে অত প্রশ্ন করো না, তাহলে আড়ি।

তবু জানতে ইচ্ছে করে!

দূরের পাহাড়ে থাকি। ফুলের উপত্যকায় আমাদের বাড়ি।

তুমি কি আমাকে চেনো?

তোমার গান শুনে আমি পাগল।

তাই নাকি!

তোমার গানের কথাগুলো শুনলে মনে হয়, ওগুলো আমারই মনের কথা। আহা আমি যদি তোমার মতো গানের কথা লিখতে পারতাম!

শোনো, আমার ঘরে একটা যাদুকরী আয়না আছে। সেই আয়নায় সবার ছবি ভেসে ওঠে না। যারা ভালো মানুষ। যারা স্বপ্ন দ্যাখে, যারা স্বপ্ন দেখায়, শুধুমাত্র তাদের ছবি ভেসে ওঠে। আজ যেমন তোমার ছবি ভেসে উঠেছে।

তাই বুঝি! আমাকে একবার তোমার আয়নাটা দেখাবে?

এসো।

সে আয়নার সামনে আসতেই, আয়নার ভেতর থেকে ভালবাসার গান বেজে উঠলো। স্বর্গীয় মূর্ছনা যেন!

মেয়েটি প্রশ্ন করল, এভাবে গান বাজে কেন?

ভালোবাসার ছোঁয়া পেলে। আচ্ছা, তোমার নামটাই তো জানা হয়নি।

আমি নীলাঞ্জনা। সবাই আমাকে নীলা বলে ডাকে।

আহা, কী সুন্দর নাম! কিন্তু নীলা নাকি সবার কপালে সহ্য হয় না।

নীলাঞ্জনা হেসে উঠলো। বলল, তা কেন হবে? আমি অতি সাধারণ, একেবারে সাধারণ একটা মেয়ে।

আমি বললাম, আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

তাই নাকি?

কিন্তু আমার ভালবাসার একটা শর্ত আছে।

কী?

আমি কাউকে আমার ভালোবাসার ভাগ দিতে পারবো না।

আচ্ছা। আমি তাহলে তোমাকে কী দেবো?

তুমি আমাকে স্বপ্ন দেবে, তুমি আমাকে ছুঁয়ে দিলে আমি পবিত্র হয়ে যাবো, তোমার হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অনেক অনেক বছর বেঁচে থাকতে চাই। অনেক অনেক কাল জয়ী গান উপহার দিতে চাই। তুমি আমার পাশে থাকবে?

ভেবে দেখি।

কবে জানাবে?

আমার একটু সময় লাগবে।

তা লাগুক। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, তোমার মুখের দিকে চাইলে, আমি হাজার হাজার ভালবাসার গান লিখতে পারবো।

নীলাঞ্জনা বলল, আজ যাই। কাল সন্ধ্যেবেলায় আবার আসবো।

আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় নীলাঞ্জনা এলো। বলল, তোমার জন্য একটা উপহার এনেছি।

কী?

একটা মূল্যবান টুপি। এটা আমার বাবার। দ্যাখো, তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা?

আমার খুব পছন্দ। আমাকে কেউ কখনও কিছু দেয়নি। তোমার আগে আমার দিকে কেউ কখনো ফিরেও চায় নি।

শোনো, কাল সারারাত ভেবে ঠিক করলাম, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি। কারণ, গানের জগতে তুমি আমার কাছে স্বপ্নের মানুষ।

আমি গানে বারবার ভালোবাসার কথা বলেছি। সত্যিকার ভালোবাসা আমার কাছে চিরকাল অধরা থেকে গেছে।

তুমি আমার প্রেম।

তুমি আমার গানের সঞ্চারী, তুমি আমার গানের অন্তরা।

আমরা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিলাম। সামনে নীল সমুদ্র। আকাশে আলবাট্রস পাখি। জলের ওপর মাঝে মাঝে উড়ুক্কু মাছ ভেসে উঠছিল।

নীলাঞ্জনা বলল, বাতাসে লবণের গন্ধ।

তোমার ভালো লাগছে?

ভীষণ।

চলো, আমরা দুজনে একসঙ্গে বসে সমুদ্র দেখতে দেখতে গরম কফি সামনে নিয়ে বসি।

অনেক রাতে নীলাঞ্জনা চলে গেল। আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম, দূরের লাইট-হাউসের নিচে দিয়ে ও হেঁটে যাচ্ছে।

বাতাসে ওর শাড়ির আঁচল উড়ছে।

আমি দেখছিলাম, আমার স্বপ্নের নারী দূরে হেঁটে যাচ্ছে। ওর কথা ভাবতে ভাবতে গভীর রাতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

দুদিন পর নীলাঞ্জনা এলো। বলল, এবার মাটিতে নামতে হবে তোমাকে।

কেন?

আমি তোমাকে জীবন দেখাবো।

তার মানে?

তোমার গানের কথায় প্রকৃতির পাশে মানুষের কথা আসুক।

আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও?

পৃথিবীর সমস্ত বন্দরে। সমস্ত লোকালয়ে। সাধারণ মানুষের মধ্যে।

বাহ্, এতো ভালো কথা। আমার আপত্তি কী!

তারপর নীলাঞ্জনা, তোমার সঙ্গে আমি কোথায় না গিয়েছি। কত পদ্মপাতার দিন পেরিয়ে এলাম। কত দীঘির পার দিয়ে সুপরি বনের ছায়ায় হেঁটে গেলাম। হাতে হাত রাখলাম। চোখে চোখ

রাখলাম। তুমি হয়ে উঠলে, আমার মনোবাসিতা।

তারপর একদিন শহরে বড় গানের জলসা বসলো। সেখানে গেলাম। দেখি, তোমার বন্ধু বদল হয়েছে। কী জানি কেন, তুমি আমাকে প্রবল অনীহায় দূরে সরিয়ে দিচ্ছো। তোমার জীবনে নতুন বন্ধু এসেছে। আমার চোখে জল এসে গেল। এমন করে তো কখনো ভাবি নি।

নিজেকে প্রশ্ন করলাম, আমি যে মন দিয়েছি তোমায়, সে মন তোমারই কাছে পাওয়া। তুমি তোমার নতুন বন্ধুর পাশে ছবি তুলছিলে, ব্রাত্য আমি দূরে বসে দেখছিলাম। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। অথচ, আমি মুখ ফুটে কাউকে সে কথা বলতে পারিনি।

সেদিন গানের আসরে সবচেয়ে ব্যাড পারফরমেন্স
হয়েছিল আমার। কষ্ট নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম।
আমার এই মনটাকে নিয়ে হয়েছে আমার বড় মুশকিল, একে আমি ঠিক আজও চিনতে পারিনি। অনুপ্রেরণা পেলে, তার দুনিয়া কাঁপাবার ক্ষমতা আছে। ঠিক উল্টোটা ঘটলে, সে সেদিন পাতালে। আমি নিজের ধ্বংসের ছবি নিজের চোখে দেখলাম।

বাড়ি ফিরে এলাম। আমার কাঁচ বাড়ির যাদুকরী আয়নার কাছে গেলাম। কতবার তোমার নাম ধরে ডাকলাম, নীলাঞ্জনা, নীলাঞ্জনা, নীলা----কোন সাড়া পেলাম না।
আজ আমার আয়নায় তোমার ছবি দেখতে পেলাম না। বুঝলাম, নতুন বন্ধু পেয়ে তুমি আমাকে ভুলে গেছো।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আমি সমুদ্র দেখছিলাম। লাইট-হাউসের দিকে তাকালাম। কোথাও তুমি নেই। পথের উপর বাতি স্তম্ভের ছায়ায় এসে পড়েছে।
নীলাঞ্জনা, আমি তোমাকে প্রথম দিন বলেছিলাম, নীলা সকলের কপালে সুখ সহ্য হয় না। আমারও হলো না। নতুন বন্ধুকে নিয়ে তুমি ভালো থেকো। আমাকে ভুলে যেও, নীলাঞ্জনা! আমি আর কখনো তোমাকে বিরক্ত করবো না। আমি আর কখনো তোমার কাছে আসবো না।
কথা দিলাম।

****

দিল্লির অন্দরে

দহনকাল

পীযূষকান্তি বিশ্বাস

মেহরাম নগরঃ

জুন-জুলাই মানেই আগুনের মাস। দিল্লির আকাশ আজ আর মেঘমল্লারের মেঘ চেনে না; সে চেনে কেবল সূর্যের রুদ্ররোষ। আকাশের রঙ আজ আর নীল নয়, বরং এক ধূসর পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করেছে, যেন কোনো প্রাচীন ও অলক্ষ্য অভিশাপে দগ্ধ হয়ে গেছে তার সমস্ত নীলিমা। দিল্লির বুক চিরে যখন লু-হাওয়া বয়ে যায়, তখন মনে হয় মহাকালের এক তৃষ্ণার্ত অসুর তার তপ্ত নিশ্বাস ফেলছে চরাচরে। এই সেই মেহরাম নগর, যেখানে আজ আধুনিকতার নিরেট কংক্রিট আর পালাম বিমানবন্দরের ডোমেস্টিক এয়ারপোর্টের যান্ত্রিক কোলাহল। কিন্তু এই তপ্ত পিচ আর ধোঁয়াটে বাতাসের আস্তরণের নিচে চাপা পড়ে আছে অন্য এক মেহরাম নগরের ইতিহাস—এক শীতল ও সবুজ অতীত। সেই সময়ের কথা ভাবলে আজ বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয়, যখন এই বিস্তীর্ণ প্রান্তর ছিল সবুজ ঘাসে ঢাকা এক স্নিগ্ধ চারণভূমি। আজ যেখানে বোয়িং আর এয়ারবাসের দানবীয় ইঞ্জিনের গর্জন কান ছিদ্র করে দেয়, সেখানে একদা শোনা যেত আদিম প্রকৃতির নিজস্ব সুর আর রাখালের বাঁশি।

মেহরাম নগরের এই মাটি ছিল বীর ও শ্রমজীবী মানুষের চারণভূমি। সোলাঙ্কিরা ছিল এই মাটির আদি সন্তান। এই অঞ্চলের ইতিহাসে মিশে আছে তোমোর, জাঠ, গুর্জর, রাঠোর, চৌহানদের বীরত্বগাথা। তাদের জীবন আবর্তিত হতো মাটির কাছাকাছি, আদিম প্রকৃতির পরম শীতলতায়। ভোরবেলা যখন শিশিরভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে বাছুরগুলো আলতো পায়ে চারণভূমিতে হেঁটে যেত, তখন বাতাসের তাপমাত্রা ছিল মমতাময় জননীর স্পর্শের মতো। সেই ঘাস আর আর্দ্র মাটির গন্ধে মিশে ছিল এক অকৃত্রিম প্রশান্তি। মানুষগুলোর জীবনযাত্রার ধরণ ছিল প্রকৃতির সাথে একাত্ম। মাটির ঘর, গভীর কুয়োর জল আর ঘন বৃক্ষরাজি মিলিয়ে এক প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ছিল এই জনপদে। এই যে রূপান্তর—সবুজ চারণভূমি থেকে অগ্নিগর্ভ বিমানবন্দর—এটাই কি আমাদের অগ্রগতির প্রকৃত স্বরূপ? প্রকৃতির বুক চিরে আমরা যে যান্ত্রিক সুখের প্রাসাদ গড়লাম, তা আজ আমাদেরই দহন করছে।

আক্ষরিক অর্থেই আগুনময় ছিল না এই শহর। এটি ছিল এক পরম নিশ্চিন্তের পান্থশালা। এই জনপদের নামকরণের গভীরে লুকিয়ে আছে মুঘল ইতিহাসের এক বিস্মৃত ও বর্ণিল অধ্যায়। 'মেহরাম কি সরাই'—যার আক্ষরিক অর্থ মেহরামের পান্থশালা। ইসলামি

পরিভাষায় 'মেহরাম' শব্দটি এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। মেহরাম বলতে সেইসব পুরুষদের বোঝায়, যাদের সাথে কোনো নারীর বিবাহ নিষিদ্ধ এবং যাদের সামনে পর্দা করার আবশ্যকতা নেই। এই নামকরণের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় মুঘল আমলের সেই প্রতাপশালী ও বিশ্বস্ত খোজা মেহরাম খানের চরিত্রে। মেহরাম খান ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের হেরেমের এক ঘনিষ্ঠ রক্ষক। অন্তঃপুরের রাজকীয় নারীদের কাছে তিনি ছিলেন মেহরাম—এক বিশ্বস্ত অভিভাবক, যিনি পর্দার আড়ালে সম্রাজ্ঞীদের নিরাপত্তা ও সুখ-দুঃখের দেখভাল করতেন। মুঘল যুবরাজ খুররম (যিনি পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহান নামে পরিচিত হন) মাহাবত খানের সমর্থনে আপন পিতা জাহাঙ্গীর এবং নূর জাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান ওড়ান, তখন মেহরাম খান এক রাজনৈতিক ঝড়ের মুখে পড়েছিলেন। অভিযোগ উঠেছিল যে, তিনি বিদ্রোহী শাহজাহানের সাথে গোপন যোগাযোগ রক্ষা করছেন। রাজকীয় সন্দেহের তালিকায় পড়ার পরও মেহরাম খান সেই অগ্নিপরীক্ষায় নির্দোষ প্রমাণিত হন এবং মুক্তি পান। পরবর্তীতে তিনি এই এলাকায় নিজের নামে একটি সরাই বা পান্থশালা এবং একটি বাজার নির্মাণ করেন। পর্যটক ও ভ্রমণকারীদের বিশ্রামের জন্য নির্মিত সেই সরাইখানাটি ছিল লাখোরি ইট আর রুবল গাঁথনির এক চমৎকার স্থাপত্য। সরাইয়ের প্রাচীরের ভেতরে ছিল ছায়াঘেরা বাগান এবং তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো একটি শীতল জলের চ্যানেল। আজ সেই পান্থশালার ধ্বংসাবশেষ দাঁড়িয়ে আছে বিমানবন্দরের যান্ত্রিক আস্ফালনের মাঝে। মেহরাম খাঁ যে শীতলতা ও আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই জনপদ গড়েছিলেন, আজ তা এক মল কালচারের অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে।

এই যে অসহ্য উত্তাপ, এটি কি কেবল সূর্যের তেজ বাড়ার ফল? না, এটি একটি গভীর জলবায়ুগত সমস্যা যা আমরা নিজেরাই তৈরি করেছি। দিল্লির এই রুদ্রমূর্তি কেবল আবহাওয়ার পরিবর্তন নয়, এটি আমাদের চারপাশের বাস্তুসংস্থানের চরম বিনাশের ফলাফল। মেহরাম নগরের সেই শান্ত গ্রামটি যখন পালাম বিমানবন্দরের যান্ত্রিকতায় বিলীন হয়ে গেল, তখনই আমরা হারিয়ে ফেললাম আমাদের শীতলতার মূল উৎসগুলোকে। মাটির সাথে ঘাসের সম্পর্ক চুকে গেছে, ফলে মাটি আর তাপ শোষণ করতে পারে না। এখন সর্বত্র শুধু তাপ—বায়ুমণ্ডলে তাপ, কংক্রিটে তাপ। রানওয়ে দিয়ে যখন একটি বিমান বিশালাকার আগুনের শিখা ছেড়ে আকাশে ডানা মেলে, তখন মনে হয় তা যেন আমাদের দগ্ধ ধরণীর শেষ আর্তনাদ। এই তপ্ত বায়ুমণ্ডলে আজ আর কোনো পাখির গান শোনা যায় না; কাক-চিলেরা তৃষ্ণায় ছটফট করে প্রাণ হারায়। শোনা যায় কেবল এসি মেশিনের একটানা ঘরঘর আর যান্ত্রিক বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। সোলাঙ্কিদের সেই সরল ও প্রাকৃতিক প্রশান্তি আজ ডমেস্টিক টার্মিনালের এসি মেশিনের কৃত্রিম ও ক্ষণস্থায়ী শীতলতায় খোঁজার চেষ্টা করাটা এক চরম পরিহাস। এই আগুনের ফুলকি কেবল দিল্লির আকাশে নয়, এটি এক বৈশ্বিক জলবায়ু সংকটের অংশ যা দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা এক এমন এক ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছি যেখানে শীতলতা হবে এক দুষ্প্রাপ্য

বিলাসিতা।দিল্লি ও সংলগ্ন উত্তর ভারতের পারদ আজ এমন এক উচ্চতায় পৌঁছেছে যা মানুষের সহ্যক্ষমতার বাইরে। থার্মোমিটারের পারদ যখন ৪৭ বা ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস স্পর্শ করে, তখন তা কেবল সংখ্যা নয়, বরং এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দলিল।

আরাবল্লিঃ

এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দিল্লি এন সি আর এর প্রান্তঘেঁষে থাকা সেই প্রাচীন আরাবল্লি পর্বতমালা। একসময় যা ছিল এই গাঙ্গেয় অঞ্চলের রক্ষাকবচ, এক সুপ্রাচীন সবুজ মহাপ্রাচীর। লক্ষ লক্ষ বছরের ইতিহাস বুকে নিয়ে এই পাহাড়গুলো উত্তর ভারতের তপ্ত ধূলিঝড়কে নিজের বুকে আটকে দিত, তার অরণ্যঘন উপত্যকায় বইত পরম শীতল বাতাস। কিন্তু আজ আরাবল্লির সেই রুদ্রমূর্তি নেই। মানুষের সীমাহীন লোভের করাত আর ডিনামাইটের অবিরাম বিস্ফোরণে আজ আরাবল্লির পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে। পাহাড়ের বুক চিরে পাথর উত্তোলনের যে মরণখেলা চলছে, তা কেবল এক ভৌগোলিক বিপর্যয় নয়, তা আমাদের সামষ্টিক বোধশক্তির চরম অবক্ষয়। আরাবল্লির সেই ন্যাড়া ও ক্ষতবিক্ষত পাহাড়গুলো আজ দুপুরের রোদে আয়নার মতো তাপকে প্রতিফলিত করে লোকালয়ে পাঠিয়ে দেয়। একদা যে পাহাড় ছিল শান্তির নীড় ও শীতলতার উৎস, আজ তা মানুষের হাতে পড়ে হয়ে উঠেছে এক বিশালাকার জ্বলন্ত তপ্ত কড়াই।

আগুন বাতাস । সাতচল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড । পারদ যখন থার্মোমিটারের কাঁচ ভেদ করে ওপরে ওঠার চেষ্টা করে, তখন আমরা ভাবি, এটাই হয়তো বর্তমান পৃথিবীর স্বাভাবিক তাপমাত্রা। আমরা দ্রুতগতির এই জীবনে যান্ত্রিক উত্তাপকে প্রগতির নামান্তর হিসেবে মেনে নিয়েছি। কিন্তু অলক্ষ্যে, অতি সন্তর্পণে পৃথিবীর তাপমাত্রা যে হারে বাড়ছে, তা আমরা সময়মতো উপলব্ধি করতে পারিনি। বনভূমি ধ্বংস করে কংক্রিটের জঙ্গল বানানো, নদী শুকিয়ে আবাসন গড়া—এই সবকিছুর সম্মিলিত প্রভাবে তাপমাত্রা আজ তার চূড়ান্ত সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়মেই জল যেমন গরম হতে হতে একসময় একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে ফুটতে শুরু করে, ঠিক তেমনি আমাদের পরিবেশ আজ সেই 'স্ফুটনাঙ্কে' এসে পৌঁছেছে। এখন আমরা বাষ্প হওয়ার অপেক্ষায় থাকা এক এক ফোঁটা জল, যারা উত্তাপের চরম সীমায় পৌঁছে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে বিলীন হওয়ার উপক্রম করছি।

আরাবল্লির সেই খাঁ খাঁ করা রুক্ষতা আজ আমাদের যান্ত্রিক সভ্যতার অহংকারকে উপহাস করছে। আমরা ভেবেছিলাম পাহাড় কেটে শহর বানালে আমরা উন্নত ও আধুনিক হব, কিন্তু আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে সেই পাহাড়ই ছিল আমাদের টিকে থাকার শীতল উৎস। ঠিক তেমনি, আমরা ভেবেছিলাম নৈতিকতা ও নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে কেবল বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিতে পারদর্শী হলেই আমরা সভ্য হব, কিন্তু আমরা আজ এক 'শিক্ষিত অসভ্যতার' চরম সীমায় বাস

করছি। এই যে শিক্ষা ব্যবস্থা, যা মানুষকে কেবল নিপুণ রোবট বানাচ্ছে কিন্তু সংবেদনশীল মানুষ বানাচ্ছে না, এটিই কি তবে দেশ ও জাতির অন্তিম পতনের মূল কারণ নয়? যখন একটি দেশের শিক্ষিত সমাজ সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করতে পারেনা, যখন তারা সামান্য গুজবে উত্তেজিত হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে, তখন বুঝতে হবে তাদের মানবিক বোধশক্তি আজ স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছে বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে। তারা এখন কেবল উত্তপ্ত ও প্রাণহীন জড় পদার্থ। সভ্যতার এই চরম সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আজ মেহরাম নগরের সেই সোলাঙ্কিদের আদিম জীবনদর্শন বড় বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তারা জানতেন, যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি প্রকৃতি থেকে নেওয়া এক মহাপাপ। কিন্তু আমাদের আধুনিক শিক্ষা আমাদের কেবল শিখিয়েছে 'উপভোগ' আর 'দখল'। আরাবল্লিকে ন্যাড়া করে আমরা যে আকাশচুম্বী কাঁচের অট্টালিকা বানাচ্ছি, সেই অট্টালিকার এসি মেশিনের তাপ বাইরে বেরিয়ে পরিবেশকে আরও কয়েক গুণ উত্তপ্ত করছে। আমাদের অর্জিত জ্ঞানও আজ ঠিক সেই এসি মেশিনের মতোই—নিজের ঘর ঠান্ডা রাখতে সে বাইরের বিশাল জগতকে আরও পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। এই যে চরম স্বার্থপরতার উচ্চ তাপমাত্রা, এটিই কি তবে আমাদের চূড়ান্ত ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিয়ে যাচ্ছে? আরাবল্লির ক্ষতবিক্ষত পাহাড়ের গায়ে যখন রক্তিম সূর্যাস্তের আলো পড়ে, তখন মনে হয় যেন বিশাল পাহাড়টা নীরবে রক্তক্ষরণ করছে। পাহাড়ের এই নীরব আর্তনাদ শোনার মতো কান আজ আমাদের নেই। আমাদের কান আজ যান্ত্রিক কোলাহলে আর বিদ্বেষের বক্তৃতায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাও আজ প্রতিযোগিতার আর একটি উত্তপ্ত কড়াই। শৈশব থেকেই একটি শিশুকে পরম মমতার বদলে এক নিষ্ঠুর মন্ত্র শেখানো হচ্ছে—'দৌড়াতে হবে', 'প্রথম হতে হবে', 'কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়া যাবে না'। এই যে অবিরাম অন্ধের মতো ছুটে চলা, এই প্রতিযোগিতার অবিরাম ঘর্ষণেই কি তৈরি হচ্ছে না সেই ঘাতক তাপ? মেহরাম নগরের সেই আদিম মেষপালকদের কোনো উচ্চতর ডিগ্রি ছিল না, কিন্তু তাদের ছিল জীবন ও প্রকৃতিকে বোঝার এক গভীর ও শীতল প্রজ্ঞা।

ইন্দ্রপ্রস্থঃ

ইন্দ্রপ্রস্থের আকাশ আজ আর কেবল নীলিমার অনুপস্থিতিতে ধূসর নয়, তা আমাদের সামষ্টিক পাপের কার্বন-আস্তরণে ঢাকা এক বিশাল চিতা। এই মেগাসিটির হৃদপিণ্ডে আজ আর প্রাণের স্পন্দন শোনা যায় না, শোনা যায় তিন কোটি মানুষের তপ্ত নিশ্বাসের এক সম্মিলিত হাহাকার। দিল্লির জনসংখ্যা আজ যখন তিন কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে মহাবিস্ফোরণের অপেক্ষায়, তখন প্রশ্ন জাগে—এই যে অসহ্য দহন, এর প্রকৃত কারণ কি কেবল সূর্যের নিষ্ঠুরতা? বিজ্ঞানের তত্ত্ব আমাদের শেখায় 'গ্রিনহাউস এফেক্ট'-এর কথা, কার্বন ডাই অক্সাইডের সেই বিষাক্ত চাদরের

কথা যা পৃথিবীকে এক তপ্ত কড়াই বানিয়ে রেখেছে। আমরা জানি, জীবাশ্ম জ্বালানির দহন আর আমাদের বিলাসী যাপনের নির্গত তাপ ওজোন স্তরকে ছিদ্র করে সূর্যকে সরাসরি আমাদের চামড়া পোড়ানোর আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক কারণগুলোর গভীরে লুকিয়ে আছে এক চরম নৈতিক সত্য—আর তা হলো মানুষের সীমাহীন দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং প্রকৃতির প্রতি আমাদের চরম ঔদাসীন্য।

তিন কোটি মানুষের এই রুদ্ধশ্বাস ভিড়ে আজ ব্যক্তিগত আরামই শেষ কথা, সমষ্টিগত দায়িত্ববোধ এখানে এক পরিত্যক্ত ধারণা। দায়িত্ববোধের এই নিদারুণ প্রতুলতা আজ দিল্লির প্রতিটি মোড়ে, প্রতিটি সিগন্যালে প্রকট। একটি সমাজ যখন তার নিয়মকানুনকে কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ রাখে এবং রাজপথে নেমে 'রুল ব্রেক' করাকেই চাতুর্য মনে করে, তখন সেই সমাজের পতন অনিবার্য। দিল্লির রাজপথে আজ শৃঙ্খলা এক অলীক কল্পনা; সবাই আগে যেতে চায়, সবাই অন্যকে মাড়িয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে চায়। এই যে 'সবার আগে যাওয়ার নেশা' আর 'অন্যকে তুচ্ছ করার মানসিকতা', এটিই আসলে আমাদের ভেতরের সেই ক্রমবর্ধমান তাপের উৎস। তাপমাত্রা যখন বাড়ে, তখন পদার্থের অণুগুলো যেমন বিশৃঙ্খলভাবে ছোটাছুটি করে, তিন কোটির এই জনসমুদ্রও আজ ঠিক তেমনই বিশৃঙ্খল। নীতিমালার তোয়াক্কা না করে যেখানে-সেখানে বর্জ্য ফেলা, যমুনার বুকে বিষ ঢালা আর প্লাস্টিকের স্তূপে শহরকে শ্বাসরুদ্ধ করা—এসবই আমাদের সেই চরম দায়িত্বহীনতার সাক্ষ্য দেয়।

ইন্দ্রপ্রস্থের এই দহন আসলে আমাদের বিবেকের দহন। যখন একটি দেশের নাগরিক তার নিজের পরিবেশের প্রতি ন্যূনতম মমতা অনুভব করে না, যখন সে কেবল ভোগ করতেই শেখে কিন্তু রক্ষা করতে শেখে না, তখন প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারিয়ে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। দিল্লির এই গরম তাই কেবল আবহাওয়ার খামখেয়ালি নয়; এটি আমাদের সেই যান্ত্রিক ও সংবেদনহীন মানসিকতারই এক অনিবার্য প্রতিফলন। ইন্দ্রপ্রস্থের এই তপ্ত ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আজ মনে হয়, আমরা কি সত্যিই অগ্রগতির শিখরে উঠছি? নাকি আমরা তিন কোটি মানুষ মিলে এক অতল গহ্বরের দিকে ঝাঁপ দিচ্ছি? জল নেই, জমি শেষ, আর অবশিষ্ট যেটুকু মনুষ্যত্ব ছিল, তাও আজ স্ফুটনাঙ্কের তাপে বাষ্প হয়ে উড়তে শুরু করেছে। এই যে নৈতিক খরা, এই যে দায়িত্ববোধের চরম শূন্যতা—এটাই কি তবে আধুনিক সভ্যতার প্রকৃত সংজ্ঞা? তিন কোটির এই রুদ্ধশ্বাস ভিড়ে আজ একেকটি মানুষ যেন একেকটি বিচ্ছুরিত পরমাণু, যারা কেবল নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে গোটা পরিবেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এই আগুন নেভানোর শক্তি কোনো প্রযুক্তি বা কোনো বিজ্ঞানের নেই, যদি না আমাদের অন্তরে সেই হারানো দায়িত্ববোধ আর প্রকৃতির প্রতি মৈত্রীর শীতল বোধটুকু ফিরে আসে।

সোস্যাল মিডিয়াঃ

মেহরাম নগরের এই বাহ্যিক দহন আজ আর কেবল সূর্যের উত্তাপে সীমাবদ্ধ নেই; তা আজ আমাদের হাতের মুঠোয় থাকা ওই ক্ষুদ্র কাঁচের পর্দার নীল আলোয় এক ভয়ঙ্কর 'মানসিক দাবানল' হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবী আজ আর কেবল মাটি, জল আর বাতাসের পিঞ্জর নয়; তা আজ এক অদৃশ্য তড়িৎ-তরঙ্গ আর সিলিকন চিপের মায়াজালে বন্দি এক বিশালাকার বৈশ্বিক অগ্নিকুণ্ড। সোশাল মিডিয়া—যাকে একসময় ভাবা হয়েছিল দূরত্বের সেতুবন্ধন, আজ তা পরিণত হয়েছে এক অনিয়ন্ত্রিত বিষবাষ্পের আঁতুড়ঘরে। পোস্ট, কমেন্ট আর প্রতিক্রিয়ার নামে সেখানে আজ যা চলছে, তা কোনো সুস্থ সভ্যতার পরিচয় নয়, বরং এক আদিম ও অসভ্য উল্লাস। এই ডিজিটাল জগতের তাপমাত্রা আজ দিল্লির রাজপথের উত্তাপকেও হার মানিয়েছে।

এই নতুন জগতের সবচেয়ে বড় সংকট হলো এর 'ছদ্মবেশ' এবং 'নিষ্ক্রিয় দায়িত্ববোধ'। পর্দার ওপারে বসে থাকা মানুষটির প্রকৃত পরিচয় কী, তার সামাজিক দায়বদ্ধতা কতটুকু—তা আজ কুয়াশাচ্ছন্ন। যেহেতু এখানে সঠিক মানুষকে চিনে নেওয়া বা তার অপরাধের জন্য সরাসরি দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া প্রায় অসম্ভব, তাই একদল মানুষ অত্যন্ত কদর্যভাবে এই ধরাছোঁয়ার বাইরের জগতের সুযোগ নিচ্ছে। অভদ্রতা করেও পার পেয়ে যাওয়া আজ এক নিত্যনৈমিত্তিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। কাউকে যেহেতু সরাসরি ধরা যাচ্ছে না, তাই বাকস্বাধীনতার সেই পবিত্র সংজ্ঞাকে আজ কলুষিত করে দেওয়া হয়েছে; এর আড়ালে চলছে বিভ্রান্তিকর ন্যারেটিভ এবং পরিকল্পিত মিথ্যার কারবার। মানুষের ভেতরকার যে অবদমিত পাশবিকতা একসময় লোকলজ্জার ভয়ে গোপন থাকত, আজ তা সহস্র মুখে ফণা তুলছে এই ডিজিটাল অরণ্যে।

এই অনিয়ন্ত্রিত অসভ্যতা আমাদের চেতনার বাতিঘরটিকে তিলে তিলে নিভিয়ে দিচ্ছে। মানুষের মনের তাপমাত্রা আজ আর স্বাভাবিক নেই; তা এক নিরন্তর জ্বরে ভুগছে। আমরা আজ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অনুভূতির জগৎ থেকে যোজন যোজন দূরে সরে গেছি। মানুষের মন যখন সর্বক্ষণ উত্তেজনার পারদে চড়ে থাকে, তখন তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না কোনো ধ্রুপদী সংগীতের আলাপ, কোনো গভীর দর্শনের গদ্য বা কোনো বিমূর্ত চিত্রকলায় মনোনিবেশ করা। আমাদের মনোযোগের ক্ষমতা আজ ছিন্নভিন্ন। মানুষ আজ তথ্যের প্রকৃত সত্যতা খোঁজে না, সে কেবল সেইসব খবর বা সংবাদের পেছনে উন্মাদ হয়ে ছুটছে যা তার স্নায়ুকে উত্তেজিত করে, যা কুৎসা রটায়। এই উত্তেজনার নেশায় আমরা যে সংবাদগিলে খাচ্ছি, তার অধিকাংশই আজ ফেব্রিকেটেড বা পরিকল্পিতভাবে সাজানো মিথ্যা।

ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে—মানুষের চিন্তা করার শক্তি আজ লোপ পাচ্ছে। আর্ট, কবিতা কিংবা শিল্পকলায় মানুষের মনোনিবেশ আজ শূন্যের কোঠায়। একটি সভ্য সমাজ কি শিল্প আর সংস্কৃতি ছাড়া কোনোদিন প্রাণ ফিরে পেতে পারে? শিল্প মানে তো স্থিরতা, সংস্কৃতি মানে তো সহনশীলতা—যেখানে মন শান্ত না থাকলে কোনো সৃজনশীলতাই অঙ্কুরিত হতে পারে না। কিন্তু

যেখানে আমাদের মস্তিষ্কের পারদ সর্বক্ষণ 'ভাইরাল' হওয়ার নেশায় টগবগ করে ফুটছে, সেখানে কে পড়বে জীবনানন্দ দাশের ধীরস্থির কবিতা? কার সময় হবে মহৎ কোনো দর্শনের গোলকধাঁধায় প্রবেশের? চিত্রকর যখন তার তুলিতে কোনো প্রশান্ত গোধূলির রং মেশান, সেই রঙের আবেদন বোঝার মতো শীতল চোখ আজ আমাদের নেই। আমাদের চোখ আজ কেবল স্ক্রল করে চলা সস্তা ও উত্তেজক ক্লিপিংসে অভ্যস্ত।

ইন্দ্রপ্রস্থের এই উত্তপ্ত বাতাসের মতো আমাদের ডিজিটাল বায়ুমণ্ডলও আজ সুস্থ মানুষের নিঃশ্বাস নেওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। মানব মন যদি শান্ত না হয়, যদি আমরা এই উত্তপ্ত প্রচারণার মরীচিকা থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত সত্য আর সুন্দরের সাধনায় মনোনিবেশ না করি, তবে আমাদের আগামী প্রজন্ম কোনোদিন জানবে না যে কবিতা কী বা শিল্পের মাহাত্ম্য কী। তারা কেবল জানবে ট্রোলিং, তারা কেবল জানবে ভাইরাল হওয়া আর অন্যকে ডিজিটাল ময়দানে মাড়িয়ে যাওয়ার আদিম ও কদর্য নেশা। এই অন্ধকার থেকে মুক্তির পথ একটাই—মনের তাপমাত্রা কমিয়ে আনা, আর সেই হারানো শীতলতার ছায়ায় বসে আর একবার সত্যম শিবম সুন্দরমের বন্দনা করা। নয়তো, এই আগুনের গ্রাসে শেষ হয়ে যাবে আমাদের হাজার বছরের তিলে তিলে গড়া শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা।

যমুনাঃ

যমুনা আজ কেবল একটি নদী নয়, তা এক মৃত সভ্যতার বিষাক্ত ও রুদ্ধ ধমনী। যে কালিন্দীর তীরে দাঁড়িয়ে একদা শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মোহন বাঁশিতে শীতল সুর তুলতেন, যার নীলাভ প্রশান্তি দেখে মুনি-ঋষিরা ধ্যানে বসতেন, আজ সেই যমুনা নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এক করুণ আর্তনাদ করছে। যমুনার সেই আদিম নীলিমা আজ অদৃশ্য; তার বদলে সেখানে আজ এক গাঢ় কালচে পিচের মতো থকথকে তরল বয়ে চলেছে। এটি জল নয়, এটি আধুনিক মানুষের সীমাহীন লোভ আর যান্ত্রিক প্রগতির বিষাক্ত নিশ্বাস। প্রখর গ্রীষ্মের দহন যখন চরমে পৌঁছায়, যখন চরাচর আগুনের হলকায় ঝলসাতে থাকে, তখন যমুনার জল শুকিয়ে তলানিতে এসে ঠেকে এবং বেরিয়ে আসে তার কঙ্কালসার বীভৎস বুক। সেখানে আজ আর রুপোলি বালু নেই, নেই কোনো প্রাণের স্পন্দন; সেখানে পড়ে আছে কলকারখানার নিক্ষিপ্ত বর্জ্য, প্লাস্টিকের স্তূপ আর রাসায়নিকের বিষাক্ত সাদা ফেনা। এই ফেনা যেন যমুনার মৃত্যুর এক সুবিশাল কাফন, যা বাতাসের ঝাপটায় উড়ে এসে আমাদের লোকালয়কে নিরন্তর সংকেত দেয়—সভ্যতা আজ তার স্ফুটনাঙ্কের এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে জীবনদায়ী জলও মারণবিষে রূপান্তরিত হয়েছে।

কিন্তু এই দহনের উৎস আরও গভীরে, আরও উঁচুতে। আমাদের এই বিশাল ভূখণ্ডের জলভাণ্ডার, সেই চিরতুষারাবৃত হিমালয় আজ আর স্থির নেই। যে হিমালয়কে আমরা অজেয় ও অমর ভাবতাম, সেই মহাগিরি আজ আমাদেরই তৈরি করা উত্তাপে তিলে তিলে ঘামছে।

হিমবাহগুলো আজ রক্তক্ষরণের মতো গলতে শুরু করেছে। যমুনোত্রী আর গঙ্গোত্রীর সেই পবিত্র উৎসগুলো আজ সংকুচিত। হিমালয় যদি তার শীতল মৌনতা হারায়, যদি তার সঞ্চিত বরফ এভাবেই অসময়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে ভারতের সমতল ভূমি এক তৃষ্ণার্ত শ্মশানে পরিণত হতে সময় লাগবে না। হিমালয়ের এই গলিত অশ্রুই আজ সমতলের নদীগুলোতে প্লাবন আনে, আবার পরক্ষণেই তাদের শুকিয়ে মরুভূমি করে দেয়। নদীগুলো আজ তাদের নাব্যতা হারিয়েছে; পলি আর বর্জ্যের স্তূপে তাদের গভীরতা আজ ইতিহাস। একদা যে নদী দিয়ে বাণিজ্যতরী চলত, আজ সেখানে এক চিলতে নোংরা জলও এগোতে পারে না। এই যে নদীর মৃত্যু, এটি কেবল ভূগোলের পরিবর্তন নয়, এটি আমাদের কৃষি ও জীবনের নাড়ি ছিঁড়ে যাওয়ার পূর্বাভাস।

সেচের জলের অভাবে আজ উত্তর ভারতের বিশাল শস্যভাণ্ডার ধুঁকছে। যে কৃষক বৃষ্টির আশায় আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, তার চোখে আজ মেঘের বদলে কেবল ধুলোবালি আর আগুনের ফুলকি। জলহীনতার এই হাহাকার আমাদের এক ভয়ঙ্কর ঐতিহাসিক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। আমাদের মনে পড়ে যায় সেই মহান সিন্ধু সভ্যতার কথা। মহেঞ্জোদাড়ো আর হরপ্পার সেই সুশৃঙ্খল নগরীগুলো কি কেবল কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণে ধূলিসাৎ হয়েছিল? না, আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক ও বিজ্ঞানীরা আজ একবাক্যে বলছেন—সিন্ধু সভ্যতার পতনের মূলে ছিল এই একই রকম জলবায়ুর পরিবর্তন। নদী যখন তার গতিপথ বদলেছিল, সরস্বতী যখন শুকিয়ে মরুভূমি হয়েছিল, আর দীর্ঘস্থায়ী খরা যখন শস্যক্ষেত্রগুলোকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তখনই সেই মহিমান্বিত সভ্যতা তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। আজ যমুনার এই বিষাক্ত রূপ, হিমালয়ের এই পশ্চাদপসরণ আর মাটির নিচের জলের এই নিঃশেষিত ভাণ্ডার কি সেই একই প্রলয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে না?

ইতিহাস কি তবে নিজেকেই পুনরাবৃত্তি করছে? সিন্ধু নদের তীরের সেই মানুষগুলো হয়তো আমাদের মতোই ভেবেছিল যে প্রকৃতিকে শাসন করা যায়। আজ আমরা যান্ত্রিক আস্ফালনে পৃথিবীকে উত্তপ্ত করছি, অরণ্য কাটছি, নদীকে ড্রেন বানাচ্ছি—আর ভাবছি আমরা প্রগতির শিখরে উঠছি। কিন্তু আমাদের চারপাশের এই ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা আসলে এক মহাজাগতিক সংকেত। যখন জলবায়ুর ভারসাম্য ভেঙে পড়ে, যখন ঋতুচক্র তার ছন্দ হারায়, তখনই শুরু হয় এক সভ্যতার অন্তিম যাত্রা। যমুনার কালো জল আজ আমাদের সেই আয়না, যেখানে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। যদি আজ আমরা এই বিষাক্ত বর্জ্য আর পরিবেশগত ধ্বংসলীলা থামাতে না পারি, তবে আধুনিক এই 'ইন্দ্রপ্রস্থ' বা ডিজিটাল সভ্যতাও একদিন সিন্ধু সভ্যতার মতো মাটির নিচে চাপা পড়ে যাবে। কেবল ধ্বংসাবশেষ হয়ে থাকবে আমাদের এই অহংকারী ইমারতগুলো। প্রকৃতির এই রুদ্ররোষ থেকে বাঁচার কোনো যান্ত্রিক কবচ আমাদের নেই; যদি না আমরা হিমালয়ের সেই আদিম শীতলতা আর যমুনার সেই হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার শপথ

গ্রহণ করি। নদী মরে গেলে জীবন মরে যায়, আর জীবন মরে গেলে কোনো ইতিহাসই অবশিষ্ট থাকে না। যমুনার এই তপ্ত শ্মশানে দাঁড়িয়ে আজ সেই প্রশ্নই বারবার আমাদের বিদ্ধ করছে— আমরা কি ধ্বংসের সেই পুরনো পথেই হাঁটছি না?

যমুনার এই বিষাক্ত রূপ আমাদের রাজনীতির মতোই ঘোলাটে। নদী পরিষ্কারের নামে কোটি কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয় ঠিকই, কিন্তু নদীর জল আজও সেই তপ্ত বিষই রয়ে গেছে। কেন? কারণ আমাদের নীতিবোধ আজ বাষ্পীভূত হয়ে গেছে। ক্ষমতার অলিন্দে থাকা মানুষগুলো নদীর হাহাকার শুনতে পায় না, তারা শোনে কেবল যন্ত্রের ঘরঘর শব্দ আর অর্থের ঝনঝনানি। যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে যখন সেই বিষাক্ত ফেনাগুলোকে বাতাসের ঝাপটায় উড়তে দেখি, তখন মনে হয় আমাদের মনুষ্যত্বও বোধহয় এইভাবেই ফেনিল হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা নদীকে 'মা' ডাকি, অথচ সেই মায়ের শরীরেই ঢেলে দিচ্ছি অ্যাসিড আর সায়ানাইড। এই যে ভণ্ডামি, এটিই কি তবে আমাদের আধুনিক শিক্ষার শেষ পাঠ? শিক্ষা আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে সম্পদ উৎপাদন করতে হয়, কিন্তু শেখায়নি কীভাবে সেই সম্পদকে সুস্থভাবে রক্ষা করতে হয়।

আরাবল্লির পাথর কাটা আর যমুনার জল বিষাক্ত করা—এই দুইয়ের উৎস আসলে একই। তা হলো মানুষের অন্তহীন ভোগলিপ্সা। তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে যমুনার তলদেশের বর্জ্য থেকে নির্গত মিথেন গ্যাস বাতাসকে আরও ভারি ও উত্তপ্ত করে তোলে। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস নেওয়া আজ এক দুঃসহ দহন। আমরা যে সভ্যতা গড়েছি, তা আসলে একটি স্বনির্মিত চিতাগ্নি। আমরা নিজেদের আরামের জন্য পৃথিবীকে জ্বালিয়ে দিচ্ছি, আর সেই আগুনের আঁচে প্রথম বলি হচ্ছে আমাদের নদী, আমাদের প্রকৃতি। যমুনা যখন শুকিয়ে যায়, তখন শুধু জল কমে না, আমাদের হৃদয়ের আর্দ্রতাও শুকিয়ে যায়। জলশূন্য নদী মানেই হলো সংবেদহীন সমাজ। মানুষ যখন দেখে তার চোখের সামনে একটি নদী মরে যাচ্ছে এবং সে নির্বিকার থাকে, তখন বুঝতে হবে তার ভেতরের সহনশীলতা ও মমতা মৃতবৎ।

যমুনার এই তপ্ত শ্মশানে দাঁড়িয়ে আজ প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়—এটাই কি সেই দেশ যার জন্য আমরা গর্ব করি? এটাই কি সেই সভ্যতা যা আমরা গড়তে চেয়েছিলাম? যান্ত্রিকতার এই মরণনেশা আমাদের এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছে যেখানে তৃষ্ণা মেটানোর জন্য জল নেই, আছে কেবল রাসায়নিকের মিশ্রণ। আমাদের রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা—সবই আজ এই বিষাক্ত বর্জ্যের ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। আমরা কি পারব এই নদীকে আবার তার নীলাভ রূপ ফিরিয়ে দিতে? নাকি যমুনার এই মৃত্যুসংবাদই হবে আমাদের সভ্যতার এপিটাফ?

লুটিয়েন্স জোনঃ

দিল্লির লুটিয়েন্স জোন থেকে শুরু করে দেশের প্রান্তিক গলি—সর্বত্র আজ এক অদ্ভুত দহন। এই দহন কেবল সূর্যের নয়, এ এক ক্ষমতার দহন। মেহরাম নগরের পান্থশালায় যখন মাঠের সবুজ

ঘাসে বসে অতিথিরা বাকিটা পথযাত্রার ঠিকানা নির্ণয় করত, তখন সেই আলোচনায় এক ধরনের শীতল শুভেচ্ছা ছিল। অনতিদ্ূরে শাহিবি নদীর কুলকুল স্রোতধারা, বটগাছের ছায়ায় বসে তারা যখন কথা বলত, তখন প্রকৃতি তাদের মাথার ওপর আশীর্বাদের মতো শীতলতা ঢেলে দিত। কিন্তু আজ? আজ রাজনীতির অলিন্দে যে উত্তাপ, তা যেন কোনো এক অদৃশ্য কামারের হাঁপর থেকে নির্গত আগুনের হলকা। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে যে সিদ্ধান্তগুলো নেমে আসে, তা আজ আর জনপদের জন্য প্রশান্তির বৃষ্টি হয়ে ঝরে না; বরং তা হয়ে ওঠে তপ্ত লাভাস্রোত, যা সাধারণ মানুষের ছোট ছোট স্বপ্নগুলোকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।

রাজনীতি আজ আর সেবা নয়, তা হয়ে উঠেছে এক সর্বগ্রাসী রৌদ্রদহ। প্রতিটি নির্বাচনী প্রচার যেন এক একটি অগ্নিকুণ্ড। বক্তৃতার মঞ্চ থেকে যখন বিষোদ্গার ছড়ায়, তখন বাতাসের আর্দ্রতা নিমেষেই উবে যায়। শব্দগুলো আজ আর অর্থ বহন করে না, তারা কেবল স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে আক্রমণ করে যে বাকযুদ্ধ চালায়, তাতে সত্যের অপমৃত্যু ঘটে এবং চারপাশটা ধোঁয়াটে হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষ, প্রধানত পশুপালন, কৃষিজমির উপরে যাপন তাদের, যারা মেহরাম নগর, নজফগড়, কিলা রায় পিথোরার সবুজে সোলাংকিদের শান্তিতে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল, তারা আজ এই রাজনীতির দাবানলে দিশেহারা। তারা বুঝতে পারে না, এই যে ‘উন্নয়ন’ বা ‘বিপ্লব’-এর নামে যে উত্তাপ ছড়ানো হচ্ছে, তা কি তাদের শীতল ছায়া দেবে, নাকি তাদের শেষ সম্বলটুকুও কেড়ে নেবে? রাজনীতির এই প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে মানুষ যখন একটু শান্তির আশা করে, তখন তার সামনে মেলে ধরা হয় মরীচিকা—এক অবাস্তব সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্ন, যা মরীচিকার মতোই তৃষ্ণা না মিটিয়ে মানুষকে মরুভূমির আরও গভীরে নিয়ে যায়।

আমাদের দেশ আজ এক অদ্ভুত রাজনৈতিক মেরুকরণের শিকার। একদল সবুজ পতাকা, অন্যদল গেরুয়া । একদল, উত্তর মেরু, অন্যদল দক্ষিণ মেরু । তাপমাত্রা বাড়লে যেমন বায়ুচাপের পরিবর্তন হয় এবং ঝড়ের সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি এই রাজনৈতিক উত্তাপ আজ সমাজের পরতে পরতে বিভাজনের ঝড় তুলেছে। এক সময়ের বন্ধু আজ কেবল আদর্শের ভিন্নতায় শত্রুতে পরিণত হয়েছে। মানুষের মনের মধ্যে যে সহনশীলতার জলাধার ছিল, রাজনীতির প্রখর তাপে তা আজ শুকিয়ে কাঠ। এখন কোনো আলোচনা নেই, আছে কেবল আস্ফালন। আমরা ভুলে গেছি যে, একটি সুস্থ সমাজ টিকিয়ে রাখতে হলে ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধার সেই ‘শীতল’ মনোভাব থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের রাজনীতিকরা আজ সেই পরমতসহিষ্ণুতার বাষ্পীভবন ঘটিয়ে ফেলেছেন। তারা জানেন, মানুষকে যত বেশি উত্তেজিত করা যাবে, ভোটব্যাংকের পারদ তত বেশি চড়বে। এই যে উত্তেজনার পারদ বাড়ানো, এটিই কি তবে আধুনিক গণতন্ত্রের স্ফুটনাঙ্ক?

দিল্লির সেই লাল বেলেপাথরের অট্টালিকাগুলো থেকে যে রাজনীতির চাষ হয়, তা আজ দেশের প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়েছে। মেহরাম নগরের সেই আদিম কৃষিজীবী মানুষগুলো আজ আর মাটির গন্ধ শুকতে পারে না, তারা এখন রাজনৈতিক দলের পতাকার রঙ চেনে। সেই রঙগুলো আজ শান্তির নয়, বরং যুদ্ধের সংকেত বয়ে আনে। ক্ষমতার এই খেলা এমনই এক নিষ্ঠুর রৌদ্রদহ যে, এতে মনুষ্যত্বের ঘাসগুলো আর জন্মাতে পারে না। যখন কোনো নেতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেন যে তিনি 'দেখে নেবেন', তখন বুঝতে হবে সেই আগুন কেবল প্রতিপক্ষের ঘরে লাগবে না, তা পোড়াবে গোটা দেশের সভ্যতাকে। রাজনীতির এই উচ্চ তাপমাত্রা আমাদের মস্তিষ্ককে এমনভাবে বিকল করে দিয়েছে যে, আমরা সাধারণ জনস্বাস্থ্যের চেয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। আমরা ভুলেই গেছি যে, আগুনের কোনো ধর্ম নেই; সে যখন জ্বলে, তখন সে বিচার করে না কে ধার্মিক আর কে অধার্মিক।

এই ক্ষমতার মরীচিকা মানুষকে অন্ধ করে দিয়েছে। যে মানুষটি রোদে পুড়ে রিকশা চালায় বা যে কৃষকটি বৃষ্টির আশায় আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, তাদের জন্য রাজনীতির এই উত্তাপ কোনো সমাধান আনে না। তাদের কেবল প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, আর সেই প্রতিশ্রুতির উত্তাপে তারা আরও বেশি করে দগ্ধ হয়। আমরা কি পারি না আবার সেই মেহরাম নগরের মতো একটি ছায়াঘেরা রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করতে? যেখানে আলোচনার টেবিলে থাকবে জলের মতো শীতলতা, যেখানে অন্যের মতকে গ্রাহ্য করার মতো মনের উদারতা থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা বড় নিষ্ঠুর। দিল্লির রাজপথ থেকে শুরু করে বাংলার সবুজ প্রান্তর—সর্বত্র আজ রাজনীতির লু-হাওয়া বইছে। এই হাওয়া আমাদের ফুসফুসকে অবশ করে দিচ্ছে, আমাদের বিচারবুদ্ধিকে বাষ্পীভূত করে দিচ্ছে।

রাজনীতি যখন ধর্মের সাথে হাত মেলায়, তখন সেই উত্তাপ হয়ে ওঠে পারমাণবিক বিস্ফোরণের মতো বিধ্বংসী। তখন আর কোনো যুক্তি চলে না, কেবল চলে আবেগের দাবানল। আমরা আজ সেই দাবানলের শিকার। দেশ, মানুষ, মনুষ্যত্ব—সবই আজ এই রাজনৈতিক চুল্লিতে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। বাস্তব উন্নয়ন বলতে যা বোঝায়—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নির্মল বায়ু আর পানীয় জল—তা আজ রাজনীতির অভিধান থেকে নিখোঁজ। আমরা এমন এক 'মিনিস্টার' সংস্কৃতি তৈরি করেছি যেখানে দৃশ্যমান চাকচিক্যই শেষ কথা, মানুষের অন্তরের জ্বালা মেটানোর কোনো দায়বদ্ধতা সেখানে নেই। জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে হাততালি দেওয়া তৃষ্ণার্ত জনতা যখন বাড়ি ফেরে, তখন তাদের কলতলায় জল থাকে না, তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য কোনো নিশ্চিত দিশা থাকে না।

এই যে বাস্তব উন্নয়নের অভাব, এটিই মানুষের মনে জন্ম দেয় এক নীরব অস্থিরতা। সেই অস্থিরতা যখন চরমে পৌঁছায়, তখনই সমাজ তার সহনশীলতা হারায়। আমরা যখন দেখি কোটি কোটি টাকা খরচে উৎসব হচ্ছে, অথচ হাসপাতালে একটা বেড নেই, তখন মনের তাপমাত্রা

বাষ্পীভবনের সীমা ছাড়িয়ে যায়। রাজনীতির এই দহনকাল আমাদের শিখিয়েছে কেবল দাবি করতে আর ঘৃণা করতে। আমরা ভুলে গেছি যে, উন্নয়ন মানে কেবল বড় রাস্তা বা ফ্লাইওভার নয়, উন্নয়ন মানে হলো এমন এক সমাজ যেখানে মানুষ নির্ভয়ে শান্তিতে নিশ্বাস নিতে পারে। কিন্তু আমাদের বর্তমান শাসকরা আমাদের সেই শীতলতা দিতে ব্যর্থ। তারা কেবল জানেন কীভাবে আগুনের ওপর ঘি ঢালতে হয়। তাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতাগুলো আসলে এক একটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র নয়, বরং তা আগুনের লিলিহান শিখা। বলা যায় এই আমরা আমাদের স্ফুটনাঙ্ক পার করে যাচ্ছি ।

মেহরাম নগর আর আমাদের এই দুইদিনের পান্থশালা । সাধারণ মানুষগুলো আজ দিশেহারা। তারা দেখেছে কীভাবে তাদের চারণভূমি বিমানবন্দরের রানওয়ে হয়েছে, কীভাবে তাদের নদীটি বিষাক্ত ড্রেন হয়েছে। তারা এখন ভোট ভিক্ষার সেই মরসুমি উৎসবের দর্শক মাত্র। তাদের সামনে যে রঙিন স্বপ্নগুলো ঝোলানো হয়, রোদের তেজে সেগুলো বিবর্ণ হতে সময় লাগে না। এই যে রাজনীতির অলীক মরীচিকা, এটিই আমাদের জাতীয় অবক্ষয়ের মূল কারণ। যখন শাসকের কাছে মানুষের প্রাণের চেয়ে ক্ষমতার আসন বড় হয়ে ওঠে, তখন দেশ একটি অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়। আমরা আজ সেই কুণ্ডের ভেতরেই বাস করছি। তাপমাত্রা বাড়ছে প্রকৃতির নিয়মে নয়, বরং আমাদের অপশাসনের ধোঁয়ায়।

একটি কবিতা দিয়ে শেষ করি । কবিতাটিঃ আমার‘জ্যোস্নাবাড়ি’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে ।

ফান্দে পড়িয়া বগা

এই শহরে কবিতা লেখার মতো জল কই?
চল, দেখে আসি চান্দুর চর ।
থরে থরে সাজানো জল
চল, জলকে
জলের মতো পড়ি ।

তার চুপ থাকা , তার স্বচ্ছ চিকচিক
তার উপর আঁকা চিত্র
পাতার পর পাতা লিখিত জলকাহিনি
পাই পাই বালিহাঁস সেই
ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে
কেঁদে ফিরে যাওয়া দূর প্রাচ্যের ফ্লেমিংগো ।

জলহীনতায় উড়াল দিয়েছে পাখিরা
উড়াল দিতে চায় প্রেমহীন শহর মহিপালপুর
থমকে দাঁড়িয়েছে ভরা ট্রাফিক ব্যস্ত ফ্লাইওভার ।

এই শহরে প্রেম করার মতো বিসখা কই
জলের মতো স্বচ্ছ প্রেমিকা
আবর্তে লিখিত সর্বনাম অব্যয় অক্ষর ।

আকাশের মেঘেরা আজ একদল পাষাণ যাযাবর। তারা আসে, দিগন্তের ওপারে তাদের ধূসর ডানার ছায়া ফেলে, বজ্রের নির্ঘোষে চরাচর কাঁপিয়ে দেয়—কিন্তু সেই আস্ফালন কোনো সংবাদ বয়ে আনে না। দিল্লির তপ্ত পিচ আর মেহরাম নগরের বিমানবন্দরের ধূসর রানওয়ের ওপর এক ফোঁটাও বারিবর্ষণ হয় না। এই মেঘের প্রতারণা যেন আমাদের আধুনিক সময়েরই এক ক্রূর পরিহাস। চারদিকে কেবল শব্দের গর্জন, প্রতিশ্রুতির মেঘডম্বরু আর রাজনীতির আস্ফালন, কিন্তু তৃষ্ণার্ত প্রাণের পিপাসা মেটানোর মতো একবিন্দু শীতলতা কোথাও নেই। আমরা এক ভয়ঙ্কর খরা ও চরম জলহীনতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। শুধু কি জলের অভাব? না, এ এক নিদারুণ 'প্রেমহীনতা'। যে সমাজে মানুষের মনে মানুষের জন্য একবিন্দু করুণা নেই, যেখানে সহমর্মিতা আজ বাষ্পীভূত, সেখানে বেঁচে থাকা আর আগুনের ওপর হাঁটা একই কথা।

****

পাঠ প্রতিক্রিয়া

"পাতার ওপর লেখা আছে আমার কিছু"
কবি কামরুল বাহার আরিফ

শান্তিময় মুখোপাধ্যায়

কোথায় কি যে লেখা থাকে বা কখন তা লেখা হয়ে যায় কেউ কি জানে? কবি শুধু জানেন একটা বই-এর পাতার বসন্ত নির্ঘোষে উড়ে যাবার উচ্ছ্বাস।তাতে কত রং,কত শুকনো পাতার দীর্ঘশ্বাস! কবি এইসব অবাকগুলো দেখেন। "বনে তোর লাগাস আগুন তবে ফাগুন কিসের তরে" --- রবীন্দ্রনাথের মতো ফাগুনে আগুন মিশ্রিত এই আত্মজিজ্ঞাসা তাঁরও।

কবি কি শুধু দেখেনই,শোনেন না --- পুরাণপাতায় অবতারের ঘুমিয়ে থাকা,অনৃত জলজীবনের অট্টহাসি আর ভোরের বাতাসে রাতের কুহেলিকা? এইসব ঝঞ্ঝাধ্বস্ত, অভিমানী মেঘের জৈব বহমানতা কবির জীবনে কখন পরম হয়ে ওঠে আমরা কেউ-ই তা জানিনা।মৌহূর্তিক ভালো লাগা থেকে নীলশাড়ি হরিণী সেকারণে কবির কাছে দেবী,পায়ে তার অপরাজিতার পুষ্পার্ঘ্য। যখন ভাবি কবি কেন এতো সুগন্ধী,বাহারি ফুল থাকতে গুলবাগিচার এই ফুলটিকেই বেছে নিলেন তখন অবাক হতে হয় বৈকি! মার্কেন্ডেয় পুরাণে অপরাজিতার বর্ণনা একরকম : নীলোৎপলদলশ্যামং ভুজঙ্গাভরণান্বিতান / শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং চন্দ্রকোটিনিভাননাম।অর্থাৎ নীল পদ্মপাপড়ির মতো সর্পাঙ্গী শ্যামজা যেন শুভ্রস্ফটিকের উপর কোটি চাঁদের কিরণ বিচ্ছুরণ করছে।এ উপমা শারদশশীর দেবী মাহাত্ম্য।দুর্লঙ্ঘ্য অজপাতে কবির মানসলোকে প্রস্ফুটিত হয়েছে।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সেকালে রাজা-রাজড়ারাও শরৎকালে নবরাত্রি পার করে যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নিতেন।কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও এই সময়টিই যুদ্ধযাত্রার প্রশস্ত সময় বলে উল্লেখিত।তাছাড়া স্মার্তপন্ডিত রঘুনন্দনও তাঁর 'তিথিতত্ত্ব' বইয়ে মন্তব্য করেছেন, যে রাজা দশমী পার না করে যুদ্ধে যাবেন তার পরাজয় সুনিশ্চিত। নীল অপরাজিতা কবিতায় কবি কামরুল বাহার আরিফ যেন এই সন্দর্ভগুলোই পাঠককে কিছুটা চোরাচালিত করে মনদেবীর যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি সেরে নিলেন।

তবু কিছু কথা যেন রহিয়াই যায়।যা খুব দুর্বোধ্যও নয় আবার সহজবোধও।কিছু ঈশারা থাকে মাত্র।যার বিনিসূতোয় নগরীর উত্থান-পতন, গরিমা-ম্লানতার ক্ষুব্ধ ইতিহাস কবিতার জীয়নকাঠি হয়ে ওঠে।সেরকমই একটি কবিতা "না কোনো সহজ কথা না"। এখানে 'চর্যার ঢেউ' যেন সেই স্বপ্নলোকের চাবি। ভৌগোলিক প্রেক্ষায় উত্তর বিহার,কলিঙ্গর কিছু অংশ,বঙ্গদেশ আর কামরূপ

প্রধানত চর্যাপদের পটভূমি।রাষ্ট্রিক বিধিনিষেধের বাইরে দাঁড়িয়ে পদকর্তাগণ নদীমাতৃক বাংলার সুখ-দুঃখের নানা জীবনকথা এখানে গেঁথে রেখেছেন দ্ব্যর্থহীন সান্ধ্য ভাষায়।নৌযাত্রার বিবরণ থেকে শুরু করে নদ-নদী,শিকার,জীবিকাপ্রণালীর নানা খন্ডচিত্র সন্নিবেশিত এখানে।নদী-নৌকা-মাঝি-সাঁকো চতুবর্গীয় এই শব্দবন্ধ একারণে যেন সমগ্র চর্যার নিয়ামক হয়ে উঠেছে। " হালধরা মাঝি সরহ পা,লুই পা,কাহ্নু পা,ভুসুক পা/পাল তুলেছিলেন পরম্পরায় হরপ্রসাদ,সুনীতি,শহীদুল্লাহ"মনে করিয়ে দেয় "বিসরণ ণাবী কিঅ অঠকুয়ারী।নিঅ দেহ করুণা শূন্য মেহেরী।।তরিত্তাজলধি জিম করি মাত্র সুইনা।মঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ।।পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়ুআন।বাহসে কাহ্নি ল মায়াজাল।।..."

কবিতার আত্মপরত ভেঙে এগুনোর পথ কখনো আগলে দাঁড়ায় নক্ষত্রালোকের ঝাঁঝালো তামস।বিস্তীর্ণ আনন্দে ভাসা কান্নার মতো

আলোপাখিদের কাকলি তখন তমোনিরঞ্জন।বাহ্যিক সুরবৈভব থেকে চৈতন্য যেন বেজে উঠছে ছন্দ আলুলায়িত প্রাণে। কাগজে লেখা ভাবনাভাষা প্রলেপকারার বন্দীত্ব তুচ্ছ করে দুবাহু উৎকীর্ণ করে গাইছে "আমারে যে বাঁধবি কে রে,সে বাঁধন কি তোদের আছে?"

পাঠকের কি মনে আছে বেগম সুফিয়া কামালের 'হেমন্ত' নামের সেই কবিতাটি --- "সবুজ পাতার খামের ভেতর/হলুদ গাঁদা চিঠি লেখে/কোন পাথারের ওপার থেকে/আনলো ডেকে হেমন্তকে?" স্মরণে এলো কবি কামরুল বাহার আরিফের 'গর্ভের পবিত্র রঙে নত হই' কবিতাটি পড়তে গিয়ে।এই কাব্যগ্রন্থে কবি যে উচ্চতায় কবিতাটিকে নিয়ে গেছেন তা যেন আবহমান বঙ্গদেশের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবিবরণী। কবিতার শেষ দু-লাইন : "নত হতেও শক্তি থাকা প্রয়োজন।/হেমন্তের বরেন্দ্র প্রান্তর গর্ভের পবিত্র

রঙে কী উজাড় করা সুন্দর!" আপামর অবচেতনার ভাঁজ খুলে যেন দেখাতে চাইছে হেমন্তের সামগ্রিক ইতিহাস।নতুন চালের গন্ধে ম' ম' করা আপাত রুক্ষ,শান্ত এই ঋতুটির দ্বিতীয় মাসটিকে সম্রাট আকবর কি প্রকৃতিকে এরকম ফলবতী হতে দেখে বছরের প্রথম হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন! কৃত্তিকা ও আর্দ্রা নক্ষত্রের নামানুসারে যথাক্রমে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের কথাও অবশ্য কেউ কেউ বলে থাকেন।তা সে যাই-ই হোক, এই কবিতায় এমন এক মানবিক মুখের কথা উল্লেখিত যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গী।ইনি নরোত্তম দাস(১৫৩১-১৬১১)। অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলার প্রেমতলীর পদ্মাতীরবর্তী

গোপালপুর, খেতুরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিত্তশালী পরিবারের সন্তান হয়েও অবিসংবাদী এই পন্ডিত ও কবি মানবপ্রেমে ব্রতী হয়ে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।শুধু তাই-ই নয়, তাঁর রচিত বেশ কিছু কড়চায় বাংলা গদ্যের প্রাচীন রূপ লক্ষিত হয়।নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এই বরেন্দ্র ঋষি এভাবে বর্ণিত : "অতিবৃহদ গ্রাম শ্রীখেতুরি পূণ্য ক্ষিতি।/মধ্যে মধ্যে নামান্তর অপূর্ব বসতি।/রাজধানী স্থান সে গোপালপুর হয়।/ঐছে গ্রাম ধণাঢ্য বৈসয়।" কথিত যে শ্রী চৈতন্য একবার আবেগ বিহ্বল হয়ে পদ্মার দিকে তাকিয়ে এই মহামানবের নামে অশ্রুপাত করেছিলেন। কীর্তনের বহু ঠাট ও রীতির প্রবক্তাও এই নরোত্তম দাস।রানিহাটি বা রেনেটি গরাণহাটি প্রভৃতি কীর্তনরীতি এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য। খেতুরি তখন যেহেতু গরাণহাটি মহকুমার অন্তর্ভূক্ত ছিলো তাই সেই স্থানের নামানুসারেই এই রীতির নামাঙ্কন বলে গবেষকদের অনুমান।

আসলে এই বইয়ের প্রতিটি কবিতাই যেন এক একটি প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে আমাদের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে।আপাত সরল বাক্যবিন্যাস পাঠককে বিভ্রান্ত করার এক মহামন্ত্র মাত্র।এর সাংকেতিক উচ্চারণে কখনো পূর্বমানুষের পুনর্জন্ম বৃক্ষে।অবস্থান আর কাঠামোর প্রতিবর্ত উদগীরণে যা আমাদের নজর এড়িয়ে যায়।শুধু তাদের প্রগাঢ় ছায়া বরাভয় হয়ে পৃথিবীর ছাদ রূপে ঝুলে থাকে মাথার উপর।

****

লিপিসত্র

জুলাই ২০২৬ সংখ্যা
সম্পাদকঃ- রতন মতিলাল
প্রচ্ছদ- এস. ভরদ্বাজ
বর্ণ সংস্থাপনায়ঃ- ivory creative studio
সৌজন্যেঃ- এস. ভরদ্বাজ
যোগাযোগঃ-
lipisatra@gmail.com

সাধ নগর, পালাম,
দিল্লি-১১০০৪৫

প্রকাশকঃ- বাপ্পী শর্মা
tridoulpub@gmail.com